দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

মানহায আর্কাইভ-২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র
২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

সাবধান! উদারতার অর্থ বিশ্বাসের বিসর্জন নয় ৪

রাসূল ﷺ কোন স্থান অনুযায়ী ইসলামকে পরিবর্তন করেন নি। ১১

এই দীনের মূল ভিত্তি ১৫

তায়েফায়ে মানসূরাহ ২০

আপনি কি কখনো ইসলামের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছেন? ২৪

ইজতিহাদী মাসাইলে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা ৩৩

যুবকদের প্রতি শহীদ হাসান আল বান্না ৪৫

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান ৪৮

"কলমের জবাব" কিভাবে কলম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে? ৮৪

প্রিয়নবীর অপমানে.. ..... ৮৭

আল কায়েদা কি আসলেই শরীয়াহ কায়েমে অক্ষম? ৯৮

যে সকল কাজ বা আমল একজন মুসলিমকে কাফেরে পরিনত করে ১০১

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হচ্ছে দলগতভাবে একটি মুরতাদ বাহিনী ১০৭

সাবধান! উদারতার অর্থ বিশ্বাসের বিসর্জন নয়

AbdulMajed

Member

০৭-১৮-২০১৫

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা,বা,

ইসলামের সঠিক পরিচয়টুকুও যাদের নেই তাদেরকেও বলতে শোনা যায় 'ইসলাম উদারতার ধর্ম'। আসলে এ বাক্যের ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু বাক্যটির মর্ম বুঝে কিংবা সঠিক অর্থে বাক্যটির প্রয়োগকারী অনেক কম।

বাস্তবতা হল, উদারতা যদি থাকে তবে তা শুধু ইসলামেই আছে। কেননা ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন। এছাড়া অন্য সকল ধর্মই বাতিল ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে কোনো উদারতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা উদারতা নয়। কেননা ভূ-পৃষ্ঠে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো অধিকারই তাদের নেই। এরপরও তারা মুসলিম উম্মাহর অধিকার লুণ্ঠনকারী ও তাদের প্রভু রাববুল আলামীনের বিদ্রোহী হয়ে পৃথিবীতে শাসন করে চলেছে। এজন্য তারা উদারতার দাবিদার হওয়ার যোগ্য নয়।

ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এবং নেককার মুসলিমই হল ভূ-পৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তারা যদি ভূ-মন্ডল ও আকাশমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা রাববুল আলামীনের বিদ্রোহীদের জন্য কিছু অধিকার স্বীকার করে নেয় তাহলে এটিই হবে উদারতা। আর নিঃসন্দেহে ইসলাম অমুসলিমদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আমীর, খলীফা ও প্রত্যেক ব্যক্তি সে অধিকারগুলো আদায় করে আসছে। উদারতার অর্থ হচ্ছে, ইসলাম অমুসলিমদের জন্য যেসব অধিকার নির্ধারণ করেছে, যে শ্রেণীর অমুসলিমের জন্য যেসব অধিকার স্থির করেছে সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করা। অমুসলিম হওয়ার কারণে তাদের প্রতি জুলুম না করা ও তাদের কোনো অধিকার খর্ব না করা। তারা যেন পূর্ণ নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারে

সে ব্যবস্থা করা। তাদের মধ্যে কেউ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে তার সাহায্য সহযোগিতা কিংবা দান-সদকা (নফল) থেকে বিরত না থাকা। তবে ইসলামের দন্ডবিধি (হুদূদ-তাযীর-কিসাস) যে কোনো অপরাধীর জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে ইসলামী ফিকহে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা অমুসলিম অপরাধীর উপরও প্রয়োগ হবে।

আর ইসলামের জিহাদ তো হয় যুদ্ধবাজ ও বিদ্রোহী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে, অমুসলিম দেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নয়। তবে এর জন্যও ইসলামে রয়েছে পৃথক বিধান ও নির্দিষ্ট সীমারেখা, যার যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই জিহাদ হয় রহমত।

বলাবাহুল্য যে, অমুসলিমদের যুদ্ধটা বাস্তবতা, হিকমত ও বিধান-সকল দিক থেকে ইসলামী জিহাদ থেকে ভিন্ন। তাই সেটি কখনো রহমত হয় না; বরং তা হল আগাগোড়া ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা।

এটাই হল উদারতার শরঈ মর্ম। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ উদাসীনতার কারণে আর কিছুটা পশ্চিমা প্রচার-প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ আজ উদারতার ভুল অর্থ বুঝতে শুরু করেছে। কেউ কেউ মনে করে, উদারতার অর্থ হল সব ধর্মকেই সঠিক বলা ও যে কোনো ধর্মের অনুসরণকেই বৈধ বলা। (নাউযুবিল্লাহ)

আবার অনেকে মনে করে, উদারতা প্রমাণের জন্য মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, তাদের ধর্মীয় শাআইর ও প্রতীক এবং আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে!! অনেকে তো এমনও বলে যে, শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। তাদের আকাইদ ও দর্শনকে ভালো চোখে দেখা বা উপস্থাপন করাও কাম্য। (নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ) কেউ আবার উদারতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, ইসলাম শুধু এবং শুধু শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। এতে জিহাদ নামে কিছু নেই। তাদের হয়তো জানা নেই যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইসলাম জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরয করেছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত এক অমোঘ বিধান। এর বিধান ও সীমারেখা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। আর অত্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে ফিকহী কিতাবসমূহে 'কিতাবুল জিহাদ'

কিংবা 'কিতাবুস সিয়ার' (জিহাদ বা সিয়ার অধ্যায়) শিরোনামে উল্লেখ রয়েছে। এসকল বিধান ও সীমারেখার যথার্থ পালনের মাধ্যমেই কেবল জিহাদ হয় রহমত এবং সকল ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধের একমাত্র রববানী প্রতিষেধক। মোটকথা, আলোচনার শুরুতে উদারতার যে অর্থটি উল্লেখ করা হয়েছে এটিই হল সঠিক অর্থ, এছাড়া অন্য যেসব অর্থ উপরে বলা হয়েছে, যেগুলো দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তৈরি করেছে তা স্পষ্ট কুফর। এগুলোর কোনো একটি অর্থকে সঠিক মনে করা কিংবা এটাকে ইসলামের শিক্ষা আখ্যা দেওয়া মূলত কুরআনের সরাসরি বিরোধিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহের শামিল। বিশদ আলোচনার পরিবর্তে আমরা পাঠকদের সামনে এ বিষয়ে কুরআন মজীদের কিছু আয়াতের শুধু তরজমা পেশ করছি :

(তরজমা) এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন সে তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিত জেন, শিরক চরম জুলুম। আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি-(কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে-তুমি শুকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে।

তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে। এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা কিছু করতে। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৩-১৫)

(তরজমা) হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না। যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে তারা জালেম সাব্যস্ত হবে।

'(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ, যা

তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসায়, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। (সূরা তাওবা (৯) : ২৩-২৪)

(তরজমা) 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে ঙবন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে কর ও যা কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

'কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফয়াসালা করবেন। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছে, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে অবশ্যই বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাতের দুআ করব, যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোনো উপকার করার এখতিয়ার রাখি না।

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে আমরা রুজু হয়েছি এবং আপনারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই কেবল আপনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

‘(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপন্থার) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে), আল্লাহ সকলের থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন, আপনিই প্রশংসার্হ। (সূরা মুমতাহিনা (৬০) : ১-৬)

(তরজমা) ‘বস্ত্তত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ এর বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত আছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।

‘(যারা এই সফল সওদা করেছে, তারা কারা?) তারা তওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সওম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অন্যায় কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। (হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

‘এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে

শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তা তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী। ‘আর ইবরাহীম নিজ পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, সে তাকে (পিতাকে) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো অত্যধিক উহ্-আহকারী ও বড় সহনশীল ছিল।’ (সূরা তাওবা (৯) : ১১১-১১৪)

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহর কোনো বান্দা, কুরআন মজীদের এ সকল আয়াতের প্রতি যার ঈমান আছে, সে কি প্রচলিত অর্থে ‘উদারতা’র প্রবক্তা হতে পারে?

কোনো মুমিন উদারতার নামে মুদাহিন ও শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। সে তো মনে করে, উদারতা ঈমান-আকীদা বিসর্জন দেওয়া নয়; সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য স্রষ্টার প্রতি নিজের ঈমানকে ধ্বংস করা নয়। আর তা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। মুমিন তো তার ঈমান-আকীদায় পর্বতমালার চেয়েও বেশি মজবুত ও দৃঢ়পদ। তার নিকট ঈমান তো নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মুমিন তো নিজ মন-প্রাণ, কথা ও কাজে ঘোষণা করে-

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমুহের প্রতিপালক। (সূরা আনআম (৬) :

১৬২)
সে তো বলে-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্ত্বার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম (৬) : ৭৯)

একজন মুমিনের সামনে তো রয়েছে দ্বীনে তাওহীদের ইমাম হযরত ইবরাহীম আ., অন্য সকল নবী ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ। সে তো কখনো শিরক ও শিরককারীদের সাথে আপোষ করতে পারে না। তার সামনে সর্বদা কুরআনের এই বিধান উদ্ভাসিত থাকে-(তরজমা) এবং (তারপর এই ঘটল যে,) তার সম্পদ্রায় তার সাথে হুজ্জত শুরু করে দিল। ইবরাহীম (তাদেরকে) বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে হুজ্জত করছ, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছ (তারা আমার কোনো ক্ষতি সাধন করবে বলে) আমি তাদেরকে ভয় করি না। অবশ্য আমার প্রতিপালক যদি (আমার) কোনো (ক্ষতি সাধন) করতে চান (তবে সর্বাবস্থায়ই তা সাধিত হবে)। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা আনআম (৬) :

৮০-৮২

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমে দৃঢ়পদ রাখুন। আমীন।

! رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(সূরা আলইমরান (৩) : ৮)

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ !

সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ! رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ!

সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০-৪১

অনুবাদ : মাসউদুয যামান

সুত্রঃ

http://www.alkawsar.com/article/৪৭৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩১৯

রাসূল ﷺকোন স্থান অনুযায়ী ইসলামকে পরিবর্তন করেন নি।

Umar Faruq

Senior Member

০৭-১৭-২০১৫

রাসূল ﷺ কোন স্থান অনুযায়ী ইসলামকে পরিবর্তন করেন নি, বরং ইসলাম অনুযায়ী সেই স্থানকে সাজিয়ে ছিলেন। এটা পাশ্চাত্যের মুসলিমদের কথার ঠিক উল্টো। তারা বলে যে, যেহেতু আমরা পাশ্চাত্যে থাকি অতএব আমাদের পশ্চিমা ইসলাম বা আমেরিকান ইসলাম দরকার। যার অর্থ মুসলিমরা অন্য যেকোন আমেরিকানদের মতই তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী চলতে পারবে। যদি অনুভব করেন যে, ঐ স্থানে থাকতে হলে আপনার ইসলামকে পরিবর্তন করতে হবে, তবে বুঝতে হবে যে, আপনার ঐ স্থান থেকে হিজরত করা অত্যান্ত জরুরী। যদি আপনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে না পারেন, তবে ঐ স্থান থেকে আপনার হিজরত করতে হবে।

রাসূল ﷺ কখনও বলেননি যে, আমার মক্কায় থাকা উচিত, ভাল নাগরিক হওয়া উচিত, কিছু দাওয়ার কাজ করা উচিত, চরমপন্থি পরচার করা থেকে বিরত হয়ে তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও ইলাহ সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা ত্যাগ করা উচিত, যাতে করে তারা ইসলামকে ভালবাসে। না, বরং রসূলু ল্লাহ ﷺইসলামকে এর পূর্ণরূপে তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এর উপর তার কোন হাত নেই এবং তিনি একে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। আল্লাহ্* তা'য়ালা কুরআনে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَÒ

হে রাসূল! তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর, তবে তো তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না। আলল্লাহ্* তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চই আল্লাহ্* কাফির সম্প্রদায়কে সত্য পথে পরিচালিত করেন না। (সূরা আল-মায়িদাঃ ৬৭)

একটি গোত্র ইসলাম কবুল করতে রাজী হল কিন্তু এক শর্তে যে, রসূলের ﷺমৃত্যুর পর তাদের ক্ষমতা দিতে হবে। রাসূল ﷺ রাজী হলেন না, কারণ এই পৃথিবী আল্লাহ্* তা'আলার এবং কে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্*র প্রতিনিধিনিত্ব ¡ করবে, তা নবীদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আরেকটি গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে রাজী হল কিন্তু তারা বলল যে , পারস্য সাম্রাজ্য থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা অপারগ। অন্য আরব গোত্র থেকে একে সুরক্ষা দিতে তারা রাজী আছে। রসূলুল্লাহ্* ﷺ বলেন যে, এই দ্বিন কেবল তারাই বহন করতে পারবে, যারা একে সবদিক থেকে ঘিরে রাখবে অর্থাৎ সর্বদিক থেকে সুরক্ষা দিবে। হয় তোমরা এই দ্বিনকে সবদিক থেকে সব আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে নতুবা তোমরা তোমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারলে না। অতঃপর রাসূল ﷺএই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। পরে রাসূল ﷺমদীনাবাসীদের তাঁর সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণে আগ্রহি দেখলেন। তারা রাসূলকে ﷺজিজ্ঞসা করলোঃ এর প্রতিদানে আমরা কি পাবো, ইয়া রসূলুল্লাহ্*? তিনি বললেন, জান্নাত, আনসাররা তাঁর এই উত্তরে ভীষণ খুশী হল এবং বললঃ কতইনা লাভজনক বানিজ্য! আমরা কখনই এর থেকে পিছু হঠব না।(সুনান আবু দাউদ)

অনেক পাশ্চাত্য মুসলিমই উসূল আল ফিকহ্*কে পরিবর্তন করে নতুন ফিকহ্* তৈরী করতে চায়, যাতে করে ইসলাম পাশ্চাত্য আদর্শকে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি তারা কিছু আকিদা বাদও দিয়ে দেয়, কারণ তা পাশ্চাত্যের জন্য খুবই চরমপন্থী। এমনকি কিছু ইবাদত বাদ দিয়ে দেয়া হয়। মূলতঃ তারা পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামকে পরিবর্তন করে ফেলছে এবং নিঃসন্দেহে এ রকম ইসলামকেই পাশ্চাত্যরা প্রচার করবে এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

সাহাবাগণ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ইসলামের প্রসার ও প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল ﷺ এর পথ অনুসরণ করেছিল। সাহাবাগণ যে কারণে মদীনা ত্যাগ করেছিল আর যে কারণে মক্কা ত্যাগ করেছিল তা এক ছিল না। বরং তারা মদীনা ত্যাগ করেছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর জন্য। ইমাম মালিক **رحمه الله** তার মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন সালমান আল ফারসীর **رضي الله عنه** কাছে তার প্রিয়বন্ধু আবু দারদার **رضي الله عنه** লেখা চিঠি এই পবিত্র ভূমিতে এসো! সালমান আল

ফারসী **رضي الله عنه** জবাব দিয়েছিলেন, " কোন পবিত্র ভূমি মানুষকে পবিত্র করে না বরং তার আমল-ই তাকে পবিত্র করে তুলে।"

তাঁরা জিহাদকে কেবল মক্কা বা মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে রাখেননি, বরং বিশ্বের যেকোন স্থানে যখনই এর পূর্বশর্তগুলো পূরণ হবে,তখনই জিহাদ হবে। যখন তুমি ফী সাবিলিল্লাহ্*র উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী যারা তোমাকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করত। তারা তোমার মতই কথা বলে এবং নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবী করে কিন্তু মুজাহিদ হওয়ার প্রমাণসমূহ বিকৃত করে, আল্লাহ্* তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

"তারা তোমাদের সাথে (জিহাদে) বাহির হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিৎ*না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য কথা শুনবার লোক আছে। আল্লাহ্* যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"

এসব মানুষ তোমাদের সামনে শাইখের বেশে আসতে পারে এবং তোমাদের বলতে পারে যে, এখন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর সময় নয় এবং তারা আলিম হওয়ার কারণে তুমি তাদের কথা শুনতে পার। আল্লাহ্* তা'য়ালা বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারে যারা তাদের কথা শুনবে।"

কেন তারা এসব লোকের কথা শোনে? কারণ তাদের পদমর্যাদা। তারা তাদের গোষ্ঠীর নেতা, এমনকি আলিমও। তারা মুসলিমদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্* পালনে নিরুৎসাহিত করে। আর যেই একজন মুসলিমকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পালনে নিরুৎসাহিত করে, সে একজন মুনাফিক, কারণ এই আয়াত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে। একজন মুসলিম যখন মুজাহিদ হয়, সে এসব লোকদের অগ্রাহ্য করে। সে এসব লোকদের রাজত্বকে পরোয়া করেনা। একজন মুজাহিদ তাই করে যা আল্লাহ্* তাকে করতে বলেন। এটা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা, যা আমরা দেখি বিশেষত আমাদের ছোট ভাইদের মধ্যে। আলিমরা তাদের উৎসাহিত করার বদলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্*র ব্যাপারে তাদের নিরুৎসাহিত করে। তাদের ইসলামিক

জামাআত পস্তুতি গ্রহণ করার বদলে তাদেরকে পিছনে ধরে রাখে। এই আয়াত সাহাবীদের বলেছে যে তোমাদের কেউ কেউ হয়তো তাদের কথা শুনত, সাহাবাদের ঈমানের কোন কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন লোকের কথা শুধুমাত্র উচ্চ মর্যাদার কারণে শুনে থাকত। কিন্তু আল্লাহ্* মুসলিম সেনাদলের সাথে মুনাফিকদের যাওয়া বন্ধ করে, এসব সাহাবীদের রক্ষা করলেন। যদি তারা যেত, তারা বরং মতনৈক্য বা ফিতনার বিস্তার করত। এই ফিতনার ভয়াবহতা এতই বেশি যে, আল্লাহ্* এমন লোকদের ব্যাপারে সাহাবাদের সর্তক করেছেন। আল্লাহ্* মহামহিম বলেনঃ

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُون

“যারা পশ্চাতে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম, যদি তারা বুঝত! সূরা আত-তওবাঃ ৮১

মুজাহিদগণ নিজেদের নফ্*সকে, শয়তানকে এবং যারা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্*র ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তাদের পরাস্ত করে। এটা একটি বড় বিজয়। যখন তারা মানুষকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে, মানুষ তখন যুদ্ধ হতে বিরত থাকে। আমাদের অধিকাংশ তরুণ আল্লাহ কে সঠিক উপায়ে সন্তুষ্ট করতে চায় কিন্তু এসব শাইখ এবং ইসলামী ব্যাক্তিত্যের (?) কারণে পারেনা, তারা এসব তরুণদের জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্* হতে পিছন থেকে ধরে রাখে। দেখ, এসব মর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা কত গুণাহ জমা করেছে। তারা যা করছে তা কুফ্*ফারদের সেবা করারই নামান্তর। তাদের দাওয়াহ কুফ্*ফারদের সেবা দেয়, তারা এর জন্য অর্থ পাওয়া হোক অথবা না হোক। তাদের সাথে ইন্টেলিজেন্সির (গোয়েন্দা বিভাগ) যোগাযোগ থাক অথবা না থাক; এতে কোন পার্থক্য নেই। যদি তোমার কাজ কুফ্*ফারদের সেবা দেয় বা উপকারে আসে, তখন তুমি তাদেরই একজন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩১৮

এই দীনের মূল ভিত্তি

Osama

Member

০৭-২৫-২০১৫

এই দীনের মূল ভিত্তি হল পথ নির্দেশকারী একটি কিতাব এবং সাহায্যকারী একটি তরবারি।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন, “যখন আমাদের একহাতে তরবারি এবং অন্য হাতে কুরআন(mushaf) থাকত। তখন রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আদেশ করতেন যে, এর মাধ্যমে(তরবারি) যারা এর(কোরআন) থেকে দূরে তাদের আঘাত কর।”

পবিত্র কোরআনের আয়াত বর্ণনা দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ বলেন, “আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। ” (৫৭:২৫)

সুতরাং নবী-রাসুল এবং আসমানী কিতাব পাঠানোর উদ্দেশ্য হল যাতে করে এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর অধিকারকে সর্বোচ্চ স্থানে নিতে পারে এবং মানুষের সাথে নায় বিচার করে। (ফতোয়া শাইখ আল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ ২৬৩/২৮) এবং মহান আল্লাহর বড় বড় অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, তিনি সমস্ত নবী-রাসুল এবং আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন এজন্য যে এর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা মানুষগণ তাদের জীবনে তাওহীদের প্রয়োগ করবে এবং তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাযথভাবে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবে। সকল নবী-রাসুল গনের বার্তা হল যে কিতাব মহান আল্লাহ তাদের উপর নাজিল করেছেন, তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর মহান অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে.....

এই কিতাবের মধ্যে আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিপূরণ করতে বলা হয়েছে। এই কিতাবের দিকে আহবান করতে বলা হয়েছে। এই কিতাবের মাধ্যমে

ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। জিহাদের জন্য এই কিতাবের মাধ্যমে উৎসাহিতকরণ এবং এই কিতাবের জন্য আনুগত্য থাকা এবং এই কিতাবের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এই কিতাব আমাদের জানায় যারা এই এই কিতাবের কথা বাস্তবায়ন করে, এই কিতাবের জন্য জিহাদ করে এবং বিজয় লাভ করে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য চিরস্থায়ী রহমত ও বরকত এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কিতাবের বিপরীতে যারা শিরক করতে আহবান করে।তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের ধসের জন্য সংগ্রাম করা। সকল প্রকার শিরক পৃথিবী থেকে পরিপূর্ণভাবে দূর করা।

এই কিতাবের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যারা আল্লাহর অধিকার বাস্তবায়ন করতে বাধা প্রদান করে, যারা এই কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে লাঞ্ছনা ও অনুতাপের পরিণতি রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জন্য কিরকমের চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

মহান আল্লাহর সকল নবী-রাসূলদের বার্তা এবং সকল আসমানি কিতাবের বার্তা এই অধিকারসমূহ দ্বারা আবর্তিত হয়েছে। এবং স্বচ্ছ লক্ষ্য হল মানুষকে আল্লাহ একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সকল নবী-রাসূল ও কিতাব এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এবং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুরা হাদিদে বলেনঃ

আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণ-শক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (৫৭:২৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি এই অধিকার থেকে ঘুরে/সরে যায় এবং এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে না এবং আল্লাহর রাসূল ও তার ঘোষণাকারীকে পরিত্যাগ করে সরে যায়। এ রকম হলে তা তলোয়ার এর মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে।

এবং এটাই হল রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদিসের অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আমাকে তরবারি দিয়ে আমাকে প্রেরন করেছেন। যেন কোন সত্তা ব্যতীত সকলেই কেবল মাত্র এক আল্লাহর

ইবাদত করে। আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে। যারা আমার আদেশ- নির্দেশ অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। (ইবনে উমর হতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন)
সুতরাং যে এই কিতাব থেকে সরে যাবে তাকে লোহা দিয়ে সংশোধন করা হবে।এ জন্য এই দীনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে কোরআন এবং তরবারি দ্বারা। (আল ফতোয়া ২৬৪/২৮)

তাই, প্রকৃত আলেম গণ আল্লাহর হককে কেন্দ্র করেই দাওয়া ও বক্তৃতা দেন। এটাই তাদের ন্যায়ের মাপকাঠি। তাদের দিন কাটে এর কথা বলেই।এতেই তাদের অবাধ বিচরণ। আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠায় তারা বন্দি হন, নির্যাতনের শিকার হন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন এবং তা করতে করতেই শহীদি সুধা পান করেন। এবং তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছে এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা। এবং কোন ব্যক্তি যদি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং এটাকে ত্যাগ করেছে, তা সংশোধন করা হয়েছে লোহা দ্বারা। সুতরাং সবাই এই ধর্মের/দীনের সত্যতা সম্পর্কে জানে। এমনকি এর শত্রুরাও এর তাওহীদ ও জিহাদ, দাওয়াহ ও কিতাল, কুরআন এবং লোহা সম্পর্কে জানে। এবং এটা তারা পরিস্কার ভাবে জানে যে, যদি তারা এই দীনকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করে তবে এই দীন তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তাদের কুটচাল/কুচাল নির্মূল করবে অ্যাজ অথবা কাল। তারা জানে যে নবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠানো হয়েছে তাদের কামনা বাসনা ও তাদের বধ করতে। নবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার আত্মীয়-স্বজন, গোষ্ঠী ও জনগণ এর মুখোমুখি হয়েছেন, যখন তারা সহজভাবে নবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা অনুসরণ করতে চাইল না। তখন তিনি তার উদ্দেশ্য তাদের জানালেন, যেন তিনি তা সঠিক ও পরিপূরণ ভাবে সম্পন্ন করতে পারে। তিনি বলেনঃ হে কুরাইশ গণ তোমরা কি আমার কথা শুনছো ? যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের নিকট কতলকারী হিসেবে এসেছি। এবং যখন মহান আল্লাহ দীন ইসলামকে ও ইসলামের জনগণকে তরবারি দ্বারা সম্মানিত করলেন, তখন তিনি তার কথাকে উত্তমভাবে পরিপূরণ করলেন। এবং আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তার পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকব, তার পথে চলতে

থাকব, তার সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করব এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকব। (আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।) (৩:১৪৬)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, " এটা দেখা যায় যে, অনেক জ্ঞানী মানুষ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করেছে অথবা যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেছে। এর অর্থ এটা বহন করে না যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে/পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দীনকে অনুসরণ করত এবং এই দীনের জন্য যারা যুদ্ধ করেছে, তারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যুদ্ধ করেছে, এটাই সাহাবা(রাঃ) বুঝতেন। এই কথার উপর ভিত্তি করে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করার পর সাহাবা রাঃ গণ বিভিন্ন বড় বড় যুদ্ধে শরীক হয়ে শাম, মিসর, ইয়েমেন, আজম(ajam), রোম, মরক্কো এবং পশ্চিম অঞ্চল বিজয় লাভ করে। তাদের সাথে যুদ্ধ করে অনেকে শাহাদাত বরণ করেছে, আহত হয়েছে, তারা মূলত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দীনের জন্যই যুদ্ধ করেছে। বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের জন্য একটি শিক্ষা হল- যারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দীনের জন্য যুদ্ধ করবে তারা মূলত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথেই যুদ্ধ করবে যদিও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করেছেন। তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবেনঃ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ(৪৮:২৯) এবং তারা এই আয়াতের ভিতরে থাকবেনঃ আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত(৮:৭৫)। সুতরাং কোন ব্যাক্তির জন্য এটা শর্ত নয় যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্যের জন্য রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে হবে। " (মাজমু আল ফতোয়া)

সুতরাং আমরা আমাদের শত্রুদের আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে উচ্চস্বরে বলব এবং আমরা তাদের এটা জানাব যে, যদি আমরা তা (আল্লাহর অধিকার) আজকে

পরিপূরণ করতে না পারি, তারা যেন এটা না ভাবে যে, তা আমরা আমাদের হিসাব হতে বাদ দিয়ে দিয়েছি। এবং এটাকে হিসাব হতে বাদ দেয়া কোন মতেই অনুমোদন যোগ্য নয়। এজন্যই আমরা দিনে, রাতে, সকাল ও সন্ধায় মহান আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করি যে, আমরা যেন দীন ইসলামের প্রত্যেক শত্রুর ঘাড়ে পৌছাতে পারি এবং আমাদের প্রতিটি কাজ ও মুহূর্ত যেন এর প্রস্তুতির জন্য ব্যায় হয়।

আর তারা তা ভাল মতোই জানে আর তারা সেইসব পথভ্রষ্ট আলেমদের সম্পর্কেও জানে যারা কুরআন এবং তলোয়ার কে পৃথক করতে চায়। তারা এই দ্বীনের ব্যাপারে তার মূর্খতা সম্পর্কে অবগত। সে (ঐ আলেম) আল্লাহ্*র আদেশসমূহের ব্যপারে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর দ্বীনের ব্যাপারে তার মূলত কোন জ্ঞান নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, “এই দীন ইসলাম হল একটি কিতাব এবং এই কিতাবের অনুসরণকারী একটি তরবারি। সুতরাং যদি কোরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান পাওয়া যায় এবং একটি তলোয়ার যদি তাকে অনুসরণ করে তখন ইসলামের আদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে” (আল ফতোয়া ৩৯৩/২০) এবং তিনি বলেনঃ এই দীনের মূল ভিত্তি হল পথ নির্দেশকারী একটি কিতাব এবং সাহায্যকারী তরবারি কিন্তু যদি তোমার প্রভু পথ নির্দেশকারী ও সাহায্যকারী হয়ে থাকে তবে তা যথেষ্ট হবে।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি

মহররম ১৪২২ হিজরি

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫৩

তায়েফায়ে মানসূরাহ

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১০-২০১৫

ওহে! ইমানদার ভাই,

আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন নাজেল করেছেন। এই কুরআন এসে শিক্ষা দিল যে, ইসলাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান।

মানুষের ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে বাস্তবায়ন করা ইসলাম আবশ্যক করে। সাথে সাথে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের বিপরিত জাহিলিয়্যাতকে দূর করার ঘোষণা দেয়।

ইসলাম শুধু শিক্ষা-গবেষনা ও দাওয়াতের মধ্যে সীমাবধ্য থাকেনা বরং অস্ত্রে-শস্ত্রে শজ্জিত জাহিলিয়্যাতের ধারক বাহীনিকে নিঃশেষ করে দ্বীনকে পূরা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদকে ফরয করে দেয়। এই পথের পথিকরা মনগড়া পথে না চলে প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহ তায়ালার বিধানকে বাস্তবায়ন করবে। এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নুসরাহ বা সাহায্য নিয়ে পূরা পৃথীবিতে তার কালিমাকে বুলন্দ করবে।তারাই হচ্ছে ত্বায়েফায়ে মানসুরাহ।

ইসলাম সবার জন্য

ইসলাম ধর্ম পরিপূরন ও সবার জন্য গ্রহন করা সহজ। একমাত্র ধ্বংস প্রাপ্ত ব্যক্তিই এই দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে।

قال عليه السلام : قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ .

আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত্রটাও তার দিনের মত (ওফাতের পরও একই অবস্থায় থাকবে)। ধ্বংস প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ এই দ্বীন থেকে বিচ্যুত হবে না।

সাহায্যপ্রাপ্তদলের অস্তিত্ব

ইসলাম শুধু কুরআন ও হাদিসে পূর্ণ রুপে বিদ্যমান শুধু তাই নয় বরং বাস্তবেও পূর্ণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল থাকবে।

قال عليه السلام : لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس

সর্বদা একটি দল দ্বীন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত তারা মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে।

জিহাদের হুকুমও স্থায়ী

শরীয়তের অনন্যা বিধানের মতো জিহাদও কেয়ামত পর্যন্ত ফরজ। পূর্ণ শরীয়তের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

قال عليه السلام : وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ

আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করার দিন থেকে শেষ উম্মত দাজ্জালকে হত্যা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন অত্যাচারীর নির্যাতন বা ইনসাফগারের ইনসাফ তাকে বন্ধ করতে পারবে না।

দ্বীনের বিজয়ী দলটির কর্ম

আহলে হক হতে হলে আবশই দ্বীনের এই ফরজটি পালন করতে হবে। অনন্যা আমাল আদাব সহ পালন করেও জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণে গুমরাহ হয়ে যাবে। কেননা একটা অংশকে ছেড়ে দিলে কোন ব্যক্তই পূর্ণ হক হতে পারে না।

قال عليه السلام : لن يبرح هذا الدين قائماً يُقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة

কেয়ামত পর্যন্ত একটি দলের কিতালের মাধ্যমে এই দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কুরানে তাদের গুনাবলি

আল্লাহ তায়ালা তাদের ৬ টা গুনের বর্ণনা দিয়েছেন।

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে ঈমান্দারগন! তোমাদের মধ্য থেকে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন দল নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন তারাও তাকে ভালবাসে, মোমিনদের প্রতি সদয় কাফের দের প্রতি কঠোর, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। আল্লাহ তায়ালা যেই হক দলটাকে বাতেলদের স্থানে নিয়া আসবেন তাদের আবশ্যকীয় গুণাবলীর প্রত্যেকটাই একমাত্র মুজাহিদদের মধ্যেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। কেননা কুরানের মাপকাঠি অনুযায়ী আল্লাহকে ভালবেসে মৃত্যু কামনা করে একমাত্র মুজাহিদরাই। মাজলুম মুসলমানদের প্রতি সদয় ও কাফেরদের প্রতি কঠুরতা তারা ছাড়া অন্যদের মধ্যে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এটাতো তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এবং দ্বীনের খাতিরে সবচেয়ে বেশি প্রোপাগান্ডার শিকার তারাই হন। তালীম, তাবলীগ, জিহাদ সবই শরীয়তের পথ। কিন্তু জিহাদ যখন ফরয হয়ে যায় তখন এই পথে না যেয়ে অন্য দিকে যাওয়াটাই ভুল। যেমন ত্বাবুকে আল্লাহর নবী সব ফেলে চলে গিয়েছিলেন। এখন যারা শরীয়ত শিক্ষা দেয়া বা করার ছুতোয় জিহাদ থেকে বসে থাকে তারা নবী আলাইহিস সালামের মানহাজ বুঝেনি। আর নববী পদ্ধতিতে দাওয়াত, তালীম ও তাজকিয়াহ বর্তমান জামানায় জিহাদ করা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। সর্বশেষ হিন্দুস্তানের আহলে হকে প্রশংসায় একটি হাদীস।

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام

.আমার উম্মতের দুতি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, এক দল হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে অন্য দল ঈসা আলাইহিসসালামের সাথে থাকবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪১৬

আপনি কি কখনো ইসলামের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছেন?

Umar Faruq

Senior Member

০৯-১৭-২০১৫

আপনি কি কখনো ইসলামের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছেন?

আমি এই নিবন্ধটি শুরু করছি একটি প্রশ্ন দ্বারা,

আমরা কি ইসলামের স্বার্থে কখনো ত্যাগ স্বীকার করেছি?

আমাদের পছন্দনীয় কোন কিছু বিসর্জন দিয়েছি?

আমাদের ভালোবাসার কোন কিছু ছেড়ে দিয়েছি?

ইসলামের জন্য এমন কোন কিছু ত্যাগ করেছি যা আমরা সঞ্চিত করে রেখেছিলাম?

যাহোক, সরল ভাষায় বললে; ইসলামের কল্যাণের জন্য আমরা কি কখনো অর্থ খরচ করেছি যা আপেক্ষিকভাবে কম পরিমাণের না? ধরা যাক, শুক্রবার দিন জুমু'আর সালাত আদায়ের সময় যখন আমাদের সামনে একটি দান বাক্স চলে আসে, আমরা তখন কি করব? কি পরিমাণ অর্থ আমরা ঐ বাক্সে রাখব? ১০ ডলার? ৫ ডলার? ১ ডলার এমনটি ৫০ সেন্ট?

এমন অনেক জিনিসই আমাদের জীবনে রয়েছে যা আমরা মিস করেছি। আমাদের জীবন যা এখনো অনেক তরুণ, আমরা মনে করি যে আমাদের দ্বীনের জন্য ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ, আমরা এই দ্বীনের বাইরের জিনিসের ব্যাপারে ত্যাগ করার দিকে আগ্রহী। যেমনঃ বন্ধুত্বের জন্য ত্যাগ স্বীকার, দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার, বন্ধুদের জন্য ত্যাগ স্বীকার, ভালোবাসার মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার এমনকি এমন কোন কিছুর জন্য ত্যাগ স্বীকার যেটা কিনা নিতান্তই কৌতুকপূর্ণ।

এইগুলোর জন্য ত্যাগ স্বীকার অনেক সহজ মনে হয়। কিন্তু ইসলামের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করাটাকে অনেক ভারী মনে হয়।

আমাদের এখনো মনে আছে যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কত উদার ব্যক্তি ছিলেন, তিনি আল্লাহর জন্য নিজের বৎসকেও জবেহ্ করার ইচ্ছা করেছিলেন। একটি সন্তানের জন্য আকুল এক পিতা, যিনি কিনা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই পুত্রকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এটাই হল সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার। "নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"(সূরা নাহলঃ১২)
আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ বেপরওয়া, প্রশংসার মালিক।"(সূরা মুমতাহিনাঃ৬) হযরত ইবরাহীম (আঃ) আমাদের সামনে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা তেমনই মহান ছিল যেমনটি ছিল ইসলামের প্রতি তাঁর ভালোবাসার স্পৃহা। সেই স্পৃহাটাই আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

আমাদের ভালোবাসা এবং ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা এখনো অনেক ক্ষুদ্র। অবশ্যই এই ধরনের ত্যাগ স্বীকার কোন প্রকার অনুশীলন ব্যতীত সম্ভব ছিল না। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকওয়ার বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর তিনি সেগুলোর প্রত্যেকটিতে শতভাগ সফলতার সাথে পাস করেছিলেন। মনে করে দেখুন, কিভাবে ইবরাহীম (আঃ) মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে তাঁর পত্নীকে নির্বাসিত করেছিলেন। এগুলোর সবই হল পরীক্ষা যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থে আমাদের ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা নিরূপিত হয়।

❒সময় এসেছে ত্যাগ স্বীকারের প্রশিক্ষণ লাভ করার,আসুন জেনে নিই একজন সাহাবীর ঘটনা এবং তিনি ইসলামের জন্যে কি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সেই ঘটনা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন অতি সাধারণ সাদামাটা একজন লোক কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হলেন, তিনি সা'দ আল আসওয়াদ আল সুলুমি নামে পরিচিত, তিনি জানতে চাইলেন, "হে আল্লাহর

রাসূল, আমিও কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব?"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, "অবশ্যই! অবশ্যই তুমিও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে যদি তুমি একজন বিশ্বাসী হয়ে থাক"। সা'দ অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি! আমি তো বিশ্বাসীদের মাঝেও অতি সাধারণ নগণ্য একজন মানুষ !"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে সা'দ অন্যান্য বিশ্বাসীদের জন্যে যা পুরষ্কার রয়েছে তোমার জন্যেও অনুরুপ রয়েছে," "তাহলে কেন কেউই তার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হয়না?", সা'দ জানতে চাইলেন। উল্লেখ্য, তিনি এতই সাধারণ একজন লোক ছিলেন যে, সামাজিক তথাকথিত মান মর্যাদাহীনতার কথা তুলে কেউই তাদের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইবন আল-ওয়াহাব এর নিকট যাওয়ার উপদেশ দিলেন, তিনি ছিলেন মদীনার সম্ভ্রান্ত নেতাদের একজন যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর কন্যা সৌন্দর্যের কারণে অন্যান্য নারীদের চেয়ে বিশিষ্ট ও সুপরিচিত ছিলেন।

নবীজী সা'দ কে এই উপদেশ দিলেন যে তিনি যেন ইবন আল-ওয়াহাব এর নিকট গিয়ে বলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব এসেছে যে, ইবন আল-ওয়াহাব যেন সা'দ এর সাথে তাঁর কন্যার বিয়ে দেন। সা'দ তাঁর নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ইবন আল ওয়াহাব এর বাড়িতে হাজির হলেন, তিনি খুশি এবং উত্তেজনায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন। যিনি কিনা মদীনার অতি সাধারণ একজন নগণ্য মানুষ তিনি বিয়ে করবেন একজন সম্ভ্রান্ত নেতার সুন্দরী কন্যাকে! তিনি দরজার কড়া নেড়ে ইবন আল ওয়াহাবকে বললেন, আল্লাহর রাসূল আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর তিনি অনুরোধ করেছেন আপনি যেন আমার সাথে আপনার কন্যার বিয়ে দেন। ইবন আল ওয়াহাব সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তুমি ! তোমার কাছে আমার মেয়ে ! তুমি কি আমার মেয়ের সম্পর্কে কিছুই জাননা ! সে তার সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত"এবং তিনি উপদেশ দিলেন সা'দ যেন বাড়ি চলে যায়।যখন সা'দ ভগ্ন মনে হাঁটতে শুরু করলেন, তারপূর্বে ইবন আল ওয়াহাব এর কন্যা তাদের এই কথোপকথন শুনে ফেলেন, তিনি বলেন, "ও আব্বা, থামুন, থামুন ! এটা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে অনুরোধ। আমরা যদি আল্লাহর রাসূল এর অনুরোধ

প্রত্যাখান করি তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায় হবে? আমাদের অবস্থান কোথায় হবে যদি আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সচেতনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই? আমি বলছি আমরা কোথায় থাকব, আমরা এখানেই থাকব আজ আমরা যেখানে আছি !"এবং তিনি সা'দ কে বললেন, "আল্লাহর রাসূলের নিকট যান, তাঁকে বলুন আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি আছি"।

সা'দ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন এবং তিনি ছিলেন আনন্দে বিভোর ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিয়ের মোহরানা ঠিক করলেন ৪০০ দিরহাম। একথা শুনে সা'দ অবাক হয়ে বলেন, "৪০০ দিরহাম ! হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিজের চোখে কখনও ৪০০ দিরহাম দেখিনি !"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আলী, আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর নিকট যান এবং প্রত্যেককে ২০০ দিরহাম করে দিতে বলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ২০০ দিরহামের আরও বেশি করে দিলেন।

নিজের স্ত্রীর নিকট যাওয়ার পূর্বে তিনি একটি বাজারের নিকট থামলেন, তিনি ভাবলেন তাঁর স্ত্রীর জন্যে কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবেন। বাজারে অবস্থান কালেই তিনি শুনলেন, জিহাদের জন্যে আহবান করা হচ্ছে এবং অস্ত্রসহ তৈরি হবার জন্য আহবান করা হচ্ছে। সা'দ যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, "হে আল্লাহ ! আমি এই দিরহামগুলোর বিনিময়ে এমন কিছু কিনব যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে"। তিনি একটি তরবারী কিনলেন, একটি ঘোড়া কিনলেন এবং আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়ানোর জন্যে নিজের মুখমণ্ডল একটি কাপড়ে ঢেকে নিলেন। কারণ তিনি জানতেন, যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে ফেলেন তাহলে তিনি তাঁকে বাড়ি ফেরত পাঠাবেন কারণ তিনি মাত্রই বিয়ে করেছেন , তিনি সদ্য বিবাহিত।

সাহাবীরা বলাবলি শুরু করলেন, "কে এই লোক, মুখ ঢেকে ঘোড়া ছুটিয়ে জিহাদের জন্য আসছে"? আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব করলেন, "ছাড় তাকে, সে জিহাদের জন্যে আসছে"। সা'দ সাহসিকতার সাথে বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানে মিশে গেলেন, এবং এক পর্যায়ে তাঁর ঘোড়া আহত হয়ে পড়ে গেল, তিনি

মাটিতে পড়ে গেলেন, এবারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গাঢ় চামড়ার রং দেখে তাঁকে চিনে ফেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, "হে সা'দ, এটা কি তুমি?"সাদ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা মাতার জান আপনার জন্য কুরবান হোক, এটা সাদ"।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে সাদ, তোমার জন্যে জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরষ্কার নেই"একথা শুনে সাদ লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং দৌড়ে যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে গেলেন। একটু পর শোনা গেল, লোকেরা বলছে সাদ আহত হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌড়ে গেলেন সাদকে দেখার জন্যে। তিনি খুঁজতে লাগলেন, তিনি যুদ্ধাহত সাদের মাথা নিজের কোলে রাখলেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখের অশ্রু সাদের মুখমণ্ডলে পড়তে লাগল, নবীজী কাঁদতে শুরু করলেন। একটু পর তিনি হাসতে শুরু করলেন, এরপর তিনি তাকালেন।

এ অবাক করা ঘটনার সময়ে সেখানে একজন সাহাবা ছিলেন, যার নাম ছিল আবু লুবাবা, তিনি বলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজ আপনাকে এমন এক অবস্থায় দেখলাম যা আমি আগে কখনো দেখিনি, প্রথমে আপনি কাঁদলেন, এরপর হাসলেন এরপর আপনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি কাঁদলাম কারণ আমার প্রিয় একজন সাহাবী মৃত্যু বরণ করল, আমি দেখলাম সে আমার জন্যে কতটুকু ভালোবাসা সঞ্চিত করে রেখেছিল, আমি দেখলাম তাঁর ত্যাগ। কিন্তু যখন আমি দেখলাম আল্লাহর নিকট হতে তাঁর জন্যে কি অপেক্ষা করছে, সে হ'দ এ পৌঁছে গেছে"। আবু লুবাবা বলেন, "হ'দ কি?"। "এটা জান্নাতের এমন একটি ঝর্ণা যেখান থেকে কেউ পান করলে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না", নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, "এটা মধুর চেয়েও মিষ্টি আর দুধের চেয়েও সাদা, আর আমি যখন দেখলাম আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা কিরূপ, আমি হাসতে শুরু করলাম। এরপর আমি আরও দেখলাম জান্নাতে তাঁর জন্যে অপেক্ষমাণ স্ত্রীগণ সাগ্রহে দৌড়ে ছুটে আসছে, যখন তাঁদের পায়ের গোঁড়ালি আমার নজরে আসল, তখন আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম"।এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের নিকট আসলেন এবং সাদের তরবারী এবং ঘোড়া নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। তিনি এগুলো সাদের স্ত্রীকে উপহার দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন এগুলো তোমার

উত্তরাধিকার। এবং আরও জানালেন, আল্লাহ জান্নাতে সাদকে যে স্ত্রীদের সাহচর্য দান করেছেন তাঁরা আরও অনেক বেশি সুন্দরী।

❒এতক্ষণ আমরা জানলাম এমন একজন অতি সাধারণ মদীনাবাসীর কথা, যে জানতো না কিভাবে তাঁর মতন অতি সাধারণ একজন মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে, যার কাছে কিনা মেয়ে বিয়ে দিতেও কেউ রাজি হতো না। সমাজে তাঁর ছিলনা কোন মান মর্যাদা, কিন্তু মর্যাদাশীল ছিলেন তিনি মহান আল্লাহর নিকট ! কারণ তিনি জীবন এবং মরণ , জান এবং মাল ব্যয় করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে।

❒কত মহান ছিল এই আত্মত্যাগ, তিনি শুধু নিজের জান আর মালকেই কুরবানি করে ক্ষান্ত হননি, কুরবানি করেছেন এমন একটি সময়ে যখন তিনি একজন সদ্য বিবাহিত যুবক, যিনি জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও পারতেন, এমনকি তিনি আশংকা করছিলেন আল্লাহর রাসূল তাঁকে চিনে ফেললে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন, যেখানে আমরা কোন সামান্য অজুহাতে কষ্ট স্বীকার না করার পথ বেছে নেই, সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন আত্মত্যাগের পথ !

❒যেখানে তিনি নিরাপদে, আনন্দে বিভোর থাকতে পারতেন মদীনার অন্যতম সেরা সুন্দরী নারীর সদ্য বিবাহিত স্বামী হিসেবে সেখানে তিনি জিহাদের ঘোষণা শোনামাত্রই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে গেলেন ! যেখানে তিনি গিয়েছিলেন নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার উপহার ক্রয় করতে সেখান থেকে ফেরত আসলেন একটি যুদ্ধের ঘোড়া ও তরবারী কিনে! সুবহানাল্লাহ !

“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য।তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর নূর।সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই।তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর রক্ষক।সকল প্রশংসা তোমার, তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর প্রতিপালক।তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য।তোমার বাণী সত্য।তোমার দর্শন লাভ সত্য।জান্নাত সত্য।জাহান্নাম সত্য।নবিগণ সত্য।মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য।কেয়ামত সত্য”। [বোখারি : ৫৮৪২]

তিনি আল্লাহকে ভালোবেসেছিলেন সবার থেকে বেশি এবং নিজের কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করলেন।

❒আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই মহান আত্মত্যাগের ঘটনা থেকে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন, ইসলামের স্বার্থে আত্মত্যাগ করার জন্যে আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিন। আমাদেরকে দান করুন জান্নাতুল ফিরদাউস, আমিন! আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার নামে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন, তখনই রাসূলুল্লাহর সাথে জিহাদে যোগদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আল-বাররা বদরেরে যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর ফৌজের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ এটার অনুমোদন করেন নি, কেননা তাঁরা তখনো কিশোর ছিলেন। পরের বছর উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশ নিতে পারেন নি রাসূলুল্লাহর অমতের কারণে, কেবলমাত্র আল-বাররা অংশ নিতে পেরেছিলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের তাঁর এই অদম্য আকাঙ্খা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল আহযাবের যুদ্ধের সময়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে মুসলিম সৈন্যেদলে নিয়োগদান করেছিলেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, সুবহানাল্লাহ।

❒আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমারের মত হওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হল নিজেদের নফসকে (প্রবৃত্তি) নিয়ন্ত্রণের চর্চা করা। এই নফসই আমাদেরকে আত্মশ্লাঘাপূর্ণ হতে মদদ দেয়। নিজেদের অস্তিত্বের তাৎপর্য, স্বার্থপর মানসিকতা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আত্মত্যাগ স্বীকার আমাদের জন্য দুরূহ হবে।

যাদের ঈমান দুর্বল, শারীরিক বাসনা অনেক সময় তাদেরকে প্রলোভিত করতে সফল হয়। বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজের প্রকোষ্ঠে নিয়ে যায় কারণ তারা আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরণ করে না। আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"(সূরা ক্বাছাছঃ৫০)

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?"(সূরা জাছিয়াহ্ঃ২৩)

❒ঐন্দ্রিয়ীক বাসনা হল এমন একটা জিনিস যেটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে আমাদেরকে এও মনে রাখতে হবে যে এটা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত করা যাবে না। দৈহিক বাসনাকে কেবলমাত্র প্রশমিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। অবশ্যই সেটা করতে হবে ইসলামিক বিধিমালা অনুযায়ী, অন্য কোন কিছু দ্বারা নয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাওয়াতা'আলাই মানবজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। আর এই কারণেই আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য নির্দেশাবলী প্রেরিত হয়েছে, আর তা হল মানুষ আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকবে, মানুষ তার স্বীয় সত্তার মাগফেরাতের জন্যই সেটা করবে।শারিরীক প্রবৃত্তি দমন করার জন্য সেই সমস্ত কার্যাবলী পরিহার করা আবশ্যক যেগুলোর মাধ্যমে প্রবৃত্তি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

❒দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র বিষয়াবলী ত্যাগ করতে সচেষ্ট হতে হবে। প্রতিটি বৃহৎ জিনিসই শুরু হয় ক্ষুদ্র হতে। চেষ্টা করুন অল্প অল্প করে ত্যাগ স্বীকার করার। ইসলামের জন্য শক্তি, সময় ও সুযোগ ত্যাগ করার চেষ্টা করুন। তারপর ধীরে ধীরে সম্পদ ত্যাগ করার মাধ্যমে। কারণ, আমাদের আত্মিক উন্নতি লাভ করা প্রয়োজন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের আত্মা সবসময়ই নফসের প্রতি দুর্বল থাকে। তাই, একে সর্বদাই কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে। মুসলিমদের ব্যাপারে নিজেদের জড়ানোর চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন তাদের বোঝা লাঘব করার। ঐ ক্ষেত্রে এমন কোন কিছু করার চেষ্টা করুন যেগুলো আমাদের জন্য সুবিধাজনক ও আমাদের পারদর্শীতা রয়েছে। ইতস্তত করবেন না, সন্দেহবাতিক হবেন না কিংবা লজ্জা পাবেন না। এটাই হল সময়, ইসলাম আমাদের কাছ থেকে বড় কিছু পাবার অপেক্ষায় আছে।

"হে আল্লাহ ! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও, এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও।কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে

ঘৃণিত করে দাও, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও।আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ।লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর"। [আহমদ : ১৪৯৪৫]

(সংগৃহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৬

ইজতিহাদী মাসাইলে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা

Hazi Shariyatullah

Senior Member

১০-২০-২০১৫

ইজতিহাদী মাসাইল বা ফূরুয়ী মাসাইলে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক কর্মপন্থা

আজ মুসলিম উম্মাহর ট্রাজেডি এই যে, শাখাগত বা অপ্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা কলহ-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে এবং নিজেদের শক্তি খর্ব করছে। যেন কুরআন মজীদের নিষেধ-

ولا تنازعوا فتفشلوا

এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। বিষয়টা আরব-আজমের সংবেদনশীল উলামা-মাশাইখকে অস্থির করে রেখেছে। তাঁরা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীতে আরবের কিছু ব্যক্তি তাকলীদের বিরুদ্ধে এত বলেছেন এবং ফূরূয়ী মাসাইলের ক্ষেত্রে এত কড়াকড়ি করেছেন যে, যুবশ্রেণীর মাঝে দ্বীনের বিষয়ে স্বেচ্ছাচার ও লাগামহীনতার বিস্তার ঘটেছে, যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেখানের বড়দেরকে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছে। তো এখানেও ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় না থেকে আগেভাগেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আমি প্রথমে সালাফে সালেহীনের কিছু ঘটনা ও নির্দেশনা উল্লেখ করছি। এরপর ইনশাআল্লাহ বর্তমান যুগের আরব-আজমের কয়েকজন মুরব্বী আলিমের নির্দেশনা তুলে ধরব।

১. ইমাম দারিমী রাহ. (১৮১-২৫৫ হি.) তাঁর কিতাবুস সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, (তাবেয়ী) হুমাইদ আততবীল (আমীরুল মুমিনীন) উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহ.কে বললেন, 'আপনি যদি সকল মানুষকে এক বিষয়ে (এক মাযহাবে) একত্র করতেন তাহলে ভালো হত।' তিনি বললেন, 'তাদের মাঝে মতপার্থক্য না হলে আমি খুশি হতাম না।' এরপর তিনি ইসলামী শহরের গভর্ণরদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন-

ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاءهم

প্রত্যেক কওম যেন ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফায়সালা করে, যে বিষয়ে তাদের ফকীহগণ (আলিমগণ) একমত।-সুনানুদ দারিমী, পৃষ্ঠা : ১৩৪

২. ইমাম ইবনে আবী হাতেম ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন যে, খলীফা আবু জাফর মানসুর আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, আমি চাই গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে এক ইলমের (অর্থাৎ মুয়াত্তা মালিকের) অনুসরণ হোক। আমি সকল এলাকার কাযী ও সেনাপ্রধানের নিকট এ ব্যাপারে ফরমান জারি করতে চাই।

ইমাম মালেক রাহ. বললেন, 'জনাব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মতের মাঝে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদে সেনাদল প্রেরণ করেছেন, কিন্তু ইসলামের দিগ্বিজয়ের আগেই তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। এরপর আবু বকর খলীফা হয়েছেন। তাঁর আমলেও বেশি কিছু রাজ্য বিস্তার হয়নি। এরপর উমর খলীফা হয়েছেন। তাঁর সময়ে প্রচুর শহর ও জনপদ বিজিত হয়েছে। তিনি সেসব বিজিত এলাকায় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সাহাবীগণকে প্রেরণ করেছেন। সেই সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত (প্রত্যেক জনপদে সাহাবীগণের শিক্ষাই) এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

'অতএব আপনি যদি তাদেরকে তাদের পরিচিত অবস্থান থেকে অপরিচিত কোনো অবস্থানে ফেরাতে চান তবে তারা একে কুফরী মনে করবে। সুতরাং প্রত্যেক জনপদকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন এবং নিজের জন্য এই ইলমকে (মুয়াত্তা মালেক) গ্রহণ করুন।'

আবু জাফর তাঁর কথা মেনে নিলেন।'-তাকদিমাতুল জারহি ওয়াত তাদীল ২৯ ইবনে সা'দের বর্ণনায় ইমাম মালেকের বক্তব্যে উল্লেখ আছে যে-

يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا.

ইয়া আমীরাল মুমিনীন! এমনটি করবেন না। কেননা, লোকেরা (সাহাবীগণের) বক্তব্য শুনেছে, হাদীস শুনেছে, রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে এবং প্রত্যেক জনগোষ্ঠী

তাই গ্রহণ করেছে, যা তাদের নিকট পৌঁছেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে।'- আততবাকাত ৪৪০

(القسم المتمم)

খতীব বাগদাদীর বর্ণনায় আছে, ইমাম মালেক বলেন-

يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى.

ইয়া আমীরাল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে আলেমগণের মতপার্থক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য রহমত। প্রত্যেকে তাই অনুসরণ করে, যা তার নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, প্রত্যেকেই হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকেই আল্লাহর (সন্তুষ্টি) কামী।'-কাশফুল খাফা, আলআজলূনী ১/৫৭-৫৮; উকূদুল জুমান, আসসালেহী ১১

বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য এই দুটি ঘটনায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনেক উপাদান আছে।

বর্তমান যুগের আকাবির ও মাশাইখ

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. (১৩১৪ হি.-১৩৯৬ হি.)

জাওয়াহিরুল ফিকহের প্রথম খন্ডে হযরতের দুটি রিসালা আছে। দুটোই মূলত আলিমদের সমাবেশে দেওয়া বক্তব্য : ১. ওয়াহদাতে উম্মত, ২. ইখতিলাফে উম্মত পর এক নজর আওর মুসলমানোঁ কে লিয়ে রাহে আমল।

দুটো রিসালাই আমাদের পাঠ করা উচিত।

প্রথম পুস্তিকার শেষে হযরত বলেন, দায়িত্বশীল আলিমদের প্রতি ব্যথিত নিবেদন- 'রাজনীতি ও অর্থনীতির অঙ্গনে এবং পদ ও পদবীর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন তার প্রতিকার তো আমাদের সাধ্যে নেই। কিন্তু দ্বীনী ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত দলগুলোর নীতি ও কর্মপন্থার যে বিরোধ তা বোধ হয় দূর করা সম্ভব। কারণ সবার লক্ষ্য অভিন্ন। আর লক্ষ্য অর্জনে সফলতার জন্য তা অপরিহার্য। যদি আমরা ইসলামের বুনিয়াদী উসূল ও মৌলনীতি সংরক্ষণের এবং নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার স্রোত মোকাবেলাকে সত্যিকার অর্থে মূল লক্ষ্য মনে করি

তাহলে এটিই সেই ঐক্যের বিন্দু, যেখানে এসে মুসলমানদের সকল ফের্কা ও সব দল একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারে আর তখনই এই স্রোতের বিপরীতে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে বলতে হয়, এই মূল লক্ষ্যটিই আমাদের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের সমস্ত সামর্থ্য এবং জ্ঞান ও গবেষণার সমুদয় শক্তি নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় ব্যয় হচ্ছে। ওগুলোই আমাদের ওয়াজ, জলসা, পত্রিকা ও বই-পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এমন কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ এ কথা মনে করতে বাধ্য হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্ম কেবল এই দুই-চার জিনিসেরই নাম। আরো আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইখতিলাফী মাসআলাসমূহে যেই দিকটি কেউ অবলম্বন করেছে তার বিপরীতটিকে গোমরাহী এবং ইসলামের শত্রুতা আখ্যা দিচ্ছে। ফলে আমাদের যে শক্তি কুফুরি, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং সমাজে বাড়তে থাকা বেহায়াপনার মোকাবেলায় ব্যয় হতে পারত তা এখন পরস্পর কলহ-বিবাদে ব্যয় হচ্ছে। ইসলাম ও ঈমান আমাদেরকে যে ময়দানে লড়াই ও আত্মত্যাগের আহবান জানায় সেই ময়দান শত্রুর আক্রমণের জন্য খালি পড়ে আছে। আমাদের সমাজ অপরাধ ও অন্যায়ে ভরপুর, আমল-আখলাক বরবাদ, চুক্তি ও লেনদেনে ধোঁকাবাজি, সুদ, জুয়া, মদ, শূকর, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও অপরাধপ্রবণতা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশে গেছে।

প্রশ্ন হল, আম্বিয়া কেরামের উত্তরসূরী এবং দেশ ও ধর্মের প্রহরীদের নিজেদের মধ্যেকার মতপার্থক্যের বেলায় যতটা সংক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় তার অর্ধেকও কেন সেসব খোদাদ্রোহীদের বেলায় দেখা যায় না? এবং পরস্পর চিন্তাগত মতপার্থক্যের বেলায় যেমন ঈমানী জোশ প্রকাশ পায় তা ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন প্রকাশ পায় না? আমাদের বাকশক্তি এবং লেখনীশক্তি যেমন শৌর্যবীর্যের সাথে নিজেদের ইখতিলাফি মাসআলায় লড়াই করে তার সামান্যতম অংশও কেন ঈমানের মৌলিক বিষয়ের উপর আসা হুমকির মোকাবেলায় ব্যয় হয় না? মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা সকলে কেন সিসাঢালা প্রাচীরের মতো রুখে দাঁড়াই না?

সর্বোপরি আমরা এ বিষয়ে কেন চিন্তা করি না যে, নবী প্রেরণ ও কুরআন নাযিলের ঐ মহান উদ্দেশ্য, যা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এবং যা পরকে আপন বানিয়ে নিয়েছে, যা আদম সন্তানদেরকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করে মানবতার মর্যাদা দিয়েছে এবং যা সমগ্র দুনিয়াকে ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়েছে তা কি শুধু এই সব বিষয়ই ছিল, যার ভিতর আমরা লিপ্ত হয়ে আছি। এবং অন্যদেরকে হেদায়েতের পথে আনার তরীকা ও পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত দেওয়ার কি এটাই ছিল ভাষা, যা আজ আমরা অবলম্বন করেছি?

এখনো কি সময় হয়নি যে, ঈমানদারদের অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও তার নাযিলকৃত সত্যের সামনে অবনত হবে ...

শেষ পর্যন্ত তাহলে ঐ সময় কবে আসবে যখন আমরা শাখাগত বিষয়আশয় থেকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সংরক্ষণ এবং অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের সংশোধনকে নিজেদের আসল কর্তব্য মনে করব। দেশের মধ্যে খৃস্টবাদ ও কমিউনিজমের সর্বগ্রাসী সয়লাবের খবর নিব। কাদিয়ানীদের হাদীস অস্বীকার ও ধর্ম বিকৃতির জন্য কায়েম করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও এসলাহের মাধ্যমে মোকাবেলা করব।

আর যদি আমরা এগুলো না করি এবং হাশরের ময়দানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ প্রশ্ন করেন যে, আমার দ্বীন ও শরীয়তের উপর এই হামলা হচ্ছিল, ইসলামের নামে কুফরি বিস্তার লাভ করছিল, আমার উম্মতকে আমার দুশমনের উম্মত বানানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছিল, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটছিল, আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য নাফরমানি করা হচ্ছিল তখন তোমরা ইলমের দাবীদারেরা কোথায় ছিলে? তোমরা এর মোকাবেলায় কতটা মেহনত এবং ত্যাগ স্বীকার করেছ? কতজন বিপথগামী ব্যক্তিকে পথে এনেছ? তো আমাদের ভেবে দেখা উচিত সেদিন আমাদের উত্তর কী হবে?

কর্মপন্থা

এজন্য জাতির প্রতি সংবেদনশীল এবং ঈমান ও ইসলামের উসূল ও মাকসাদসমূহের প্রতি সচেতন উলামায়ে কেরামের কাছে আমার ব্যথাভরা

নিবেদন-মাকসাদের গুরুত্ব ও নাযুকতাকে সামনে রেখে সবার আগে মন থেকে এই অঙ্গীকার করুন যে, নিজেদের ইলমী ও আমলী যোগ্যতা এবং কথা ও কলমের শক্তিকে বেশির থেকে বেশি ঐ ময়দানে নিয়োজিত করবেন, যার সংরক্ষণের জন্য কুরআন ও হাদীস আপনাদের ডাকছে।

১. সম্মানিত ওলামা! এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে, এ কাজের জন্য নিজের বর্তমান ব্যস্ততার মধ্য থেকে বেশির থেকে বেশি সময় বের করবেন।

২. পরস্পর মতপার্থক্য ও ইজতিহাদী বিরোধকে কেবল নিজেদের দরস এবং লেখালেখি ও ফতওয়া পর্যন্ত সীমিত রাখবেন। আম জলসা, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, পরস্পর বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে তাকে বড় করবেন না। নবীদের মতো দাওয়াত ও ইসলাহের নীতির অধীনে কষ্টদায়ক ভাষা, নিন্দা, উপহাস, আক্রমণ ও বাক্যচালনা থেকে বিরত থাকবেন।

৩. সমাজে ছড়িয়ে পড়া ব্যধিসমূহের প্রতিকারের জন্য হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে সেণহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা ও আঙ্গিকে কাজ শুরু করুন।

৪. নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা এবং কুরআন-সুন্নাহর বিকৃতির মোকাবেলার জন্য পয়গম্বরদের দাওয়াতের নীতি অনুসারে প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল, আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা এবং হৃদয়গ্রাহী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে وجادلهم بالتي هي أحسن এর সাথে নিজের মুখের ভাষা ও কলমের শক্তিকে ওয়াকফ করে দিন।'

এ ধরনের আরেক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যে দেশকে একদিকে খৃস্টান মিশনারীরা নিজেদের পূর্ণ শক্তি এবং পার্থিব জাকজমকের সাথে খৃস্টান-রাজ্য বানানোর স্বপ্ন দেখছে আরেকদিকে প্রকাশ্যে আল্লাহর বান্দা এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, অন্যদিকে কুরআন ও ইসলামের নামে ঐসব কিছু করা হচ্ছে, যাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই কুরআন ও ইসলাম এসেছিল, সে দেশে কেবল শাখাগত মাসাইল এবং তার বিচার-পর্যালোচনা ও প্রচারণার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে ঐ মৌলিক বিষয়াদি থেকে যারা উদাসীন রয়েছি তাদের প্রতি যদি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়- তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে যখন এই সকল বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তোমরা তার জন্য কী করেছিলে, তখন আমাদের কী জবাব হবে? আমার বিশ্বাস, কোনো ফের্কা,

কোনো জামাত যখন বিভেদ-বিতর্ক থেকে উপরে উঠে এ বিষয়ে চিন্তা করবে তখন তার বর্তমান কাজকর্মের জন্য অনুশোচনা হবে এবং তার তৎপরতার রোখ বদলে যাবে। যার ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিশ্চয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

২. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আলউছাইমীন (১৪২১ হি.)

তিনি এ বিষয়ে অনেক বলেছেন এবং অনেক লিখেছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি কথা নকল করছি :

ক) ''এ যুগের কিছু কিছু সালাফী, বিরোধীদেরকে গোমরাহ বলে থাকে, তারা হকপন্থী হলেও। আর কিছু কিছু লোক তো একে বিভিন্ন 'ইসলামী' দলের মত একটি দলীয় মতবাদে পরিণত করেছে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, সালাফে সালেহীনের কর্মপদ্ধতি লক্ষ করুন, ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের নীতি কী ছিল এবং তাঁরা কেমন উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তাঁদের মাঝে তো অপেক্ষাকৃত বড় বড় বিষয়েও মতভেদ হয়েছে, কোনো কোনো (শাখাগত) আকীদা বিষয়েও মতভেদ হয়েছে : দেখুন, আল্লাহর রাসূল তাঁর রবকে দেখেছেন কিনা-এ বিষয়ে কেউ বললেন, দেখেননি; কেউ বললেন, দেখেছেন। কেয়ামতের দিন আমল কীভাবে ওজন করা হবে-এ বিষয়ে কেউ বলেছেন, আমল ওজন করা হবে। কেউ বলেছেন, আমলনামা ওজন করা হবে; তেমনি ফিকহের মাসাইল- নিকাহ, ফারাইয, ইদ্দত, বুয়ূ (বেচাকেনা) ইত্যাদি বিষয়েও তাঁদের মাঝে মতভেদ হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তো একে অপরকে গোমরাহ বলেননি।

'সুতরাং যাদের বিশ্বাস, 'সালাফী' একটি সম্প্রদায়, যার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, অন্যরা সবাই গোমরাহ, প্রকৃত সালাফী আদর্শের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সালাফী মতাদর্শের অর্থ হচ্ছে, আকিদা-বিশ্বাস, আচরণ- উচ্চারণ, মতৈক্য-মতানৈক্য এবং পরস্পর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের পথে চলা। যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; প্রীতি, করুণা ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগে মুমিনগণ যেন একটি দেহ, যার এক অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আর্তনাদ করতে থাকে। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সালাফী মতাদর্শ।' [লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ, প্রশ্ন : ১৩২২]

খ) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ উছাইমিন রাহ. জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় ২১/১২/১৪১১ হিজরী তারিখে একটি মুহাযারা (বক্তৃতা) পেশ করেছিলেন। তাতে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন-

سب العالم سبب لانتهاك السنة النبوية وسبب لانتهاك العلم الشرعي

.

'আলিমকে কটুক্তি করা সুন্নাহর অমর্যাদা ও শরয়ী ইলমের অমর্যাদার কারণ হয়ে থাকে।'

গ. 'যখন আলিমদের দিক (তাদের মান-মর্যাদা) দুর্বল হয় তখন সাধারণ মানুষের কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণও দুর্বল হয়ে যায়।'

ঘ. 'যারা আলিমদের অমর্যাদায় লিপ্ত বাস্তবে তারা সুন্নাহর আবরণ ছিন্ন করার কাজে লিপ্ত।'

ঙ. 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মন ও মুখকে সুস্থ ও সংযত রাখা।'

চ. 'আলিম ও দায়ীগণের নিন্দা-সমালোচনাকারী উম্মতকে আলিম ও দায়ীদের প্রতি বিরূপ করে থাকে। উম্মত আলিম ও দায়ীদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। তখন দ্বীন-শরীয়তের প্রতিও তাদের আস্থা থাকে না।

'সমালোচিতদের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার পর সমালোচনাকারীদের প্রতিও লোকের আস্থা থাকে না। আর এতে আনন্দিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (ইসলামের দুশমনেরা)'।-আদদাওয়াতু ইলাল জামাআতি ওয়াল ইতিলাফ পৃষ্ঠা : ১০১

৩. ড. নাসির ইবনে আবদুল কারীম আলআকল

তিনি জামিআতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ আলইসলামিয়া রিয়াদের প্রফেসর। তিনি 'আলইফতিরাক : মাফহূমুহু, আসবাবুহূ, সুবুলুল বিকায়াতি মিনহু' নামে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, জেনে বুঝে সচেতনতার সাথে ইমামগণের অনুসরণ করা হলে একেও তাকলীদ নামে আখ্যায়িত করা হয়! বলা হয়, মাশাইখের অনুসরণ হচ্ছে তাকলীদ আর তা নাজায়েয! আমাদের কাছে কিতাব আছে, জ্ঞানের বিভিন্ন মাধ্যম আছে, এখন কেন

আলিমদের কাছে যেতে হবে? এই ভুল চিন্তা খন্ডন করে তিনি বলেন, ইমাম, মাশাইখ ও আলিমগণের অনুসরণ করা ওয়াজিব ...।

'শরীয়তের দৃষ্টিতে (আহলে ইলমের) ইত্তিবা ও অনুসরণ অপরিহার্য। কারণ আম মুসলিম জনসাধারণ; বরং ইলম চর্চায় নিয়োজিত অনেকেই ইজতিহাদ তথা সঠিক পন্থায় দলীল-প্রমাণ গ্রহণে ও বিশ্লেষণে পারদর্শী নয়। তো এরা কাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করবে? এবং কীভাবে ইলম অর্জনের পদ্ধতি, সুন্নাহর নিয়ম এবং সালাফে সালেহীন ও ইমামগণের নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে? এ তো আহলে ইলমের অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়। একে (নিন্দিত ও বর্জনীয়) তাকলীদ বলে না। নতুবা প্রত্যেকেই নিজের ইমাম হবে এবং যত ব্যক্তি তত দলের উদ্ভব ঘটবে। এটা নিঃসন্দেহে ভুল। সুতরাং সঠিক পন্থায় ইমামদের অনুসরণ (নিন্দিত) তাকলীদ নয়। নিন্দিত তাকলীদ হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, (তরজমা) 'যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।'

'উলামা মাশায়েখ ও দ্বীনদার মুবাল্লিগদের থেকে বিমুখ হয়ে শুধু বইপত্রের মাধ্যমে ইলম অর্জনের চেষ্টা করা এবং মনে করা যে, এখন বইপত্র আছে, ক্যাসেট আছে, প্রচারমাধ্যম আছে, ইলম অর্জনের জন্য এগুলোই যথেষ্ট, এটা ইলম অন্বেষণের একটা মারাত্মক ভুল পদ্ধতি।'

তিনি আরো বলেন, 'বিভেদের আরেকটি কারণ 'ফিকহুল খিলাফ' তথা মতপার্থক্যের প্রকার, বিধান ও নীতি সম্পর্কে এবং 'ফিকহুল জামাআতি ওয়াল ইজতিমা' তথা ঐক্য ও মতৈক্যের নীতি ও বিধান সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির অভাব। কোন মতপার্থক্য বৈধ, কোন মতপার্থক্য বৈধ নয় অপর পক্ষকে কোন ক্ষেত্রে মাযূর মনে করা হবে, কোন ক্ষেত্রে মনে করা হবে না, তেমনি জামাআ ও ইজতিমার অর্থ কী, বিভেদ-অনৈক্যের ক্ষতি ও অনিষ্ট কী-এসব বিষয় সঠিকভাবে বোঝা উচিত।

আমার সামনে এ কিতাবের ইন্টারনেট সংস্করণ রয়েছে।

৫. শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আলমু'তায

তিনি 'আদদাওয়াতু ইলাল জামাআতি ওয়াল ইতিলাফ ওয়ান নাহয়ু আনিত তাফাররুকি ওয়াল ইখতিলাফ' নামে একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্বেষ-অনৈক্য পরিহারের আহবান জানিয়েছেন।

এ কিতাবে শায়খ ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আলফাওযানের অভিমতও রয়েছে। পুস্তিকাটিতে অনেক উদ্ধৃতি ও দলিলের সাথে বারবার বলা হয়েছে যে, ফুরূয়ী মাসআলায় মতভেদের পরও আমাদেরকে ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সকল মতভেদ কিন্তু বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে অপরিহার্য করে না। কোনো মতপার্থক্যের বিষয়ে যদি সংশয় হয় যে, তা সহনীয় কি না তাহলে এর সমাধান বড় বড় আলিমরা করবেন।

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুম

হযরত তার সফরনামা 'সফর দর সফর' এ কিরগিজিস্তানের বিবরণে লেখেন, 'এখন সেখানকার পরিস্থিতি কতকটা এমন যে, একদিকে সাধারণ মুসলমান সোভিয়েত ইউনিয়নের চলমান মতবাদ ও কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত হয়ে দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মেতে ইসলামের বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন; রাস্তাঘাটে চলাচলকারী নারীদের পোশাক থেকে বোঝার উপায় নেই যে, ইসলামী জীবনধারার সাথে তাদের ন্যূনতম যোগাযোগ আছে। অপর দিকে ধর্মীয় অভিভাবকদের মাঝে দ্বিতীয় জামাত করা, জুমার সাথে সতর্কতামূলক যোহর আদায় করা আর সালাফী বন্ধুদের উপস্থিতির সুবাদে 'আরশে সমাসীন হওয়া'র মত জটিল জটিল মাসআলা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'আলোচনার মূল বিষয় ছিল কিরগিজিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বীনী মেহনতকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনী ব্যক্তিবর্গের করণীয় কী হওয়া উচিৎ। এ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের কাছে সবিনয় নিবেদন করি যে, শাখাগত মাসআলায় ইখতিলাফ থেকে আপনাদের মনোযোগ ফিরিয়ে নিন। আপনারা নজর দিন উম্মাহর মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলোর শিক্ষা ও প্রচার প্রসারে, অধিকাংশ জনসাধারণ যে সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।

'আলহামদু লিল্লাহ এ সম্মেলন শ্রোতাদের একথার উপর শেষ হয়েছে যে, আল্লাহর রহমতে কিছু ইখতিলাফ তো মিটে গেছে। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এগুলোকে আলোচনার বিষয় বানাব না। বরং

এখন আমাদের সর্বাত্নক চেষ্টা হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর দাওয়াত ও তালীমে মনোযোগ দেওয়া। (পৃ : ১৩৬- ১৩৮)

রাশিয়ার সফরের বিবরণে লেখেন-

'রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু তরুণ আরব ভার্সিটি থেকে কম বেশি পড়াশোনা করে এসেছে। তারা কট্টর সালাফী হয়ে দেশে ফিরেছে। যেহেতু দাগিস্তানের অধিকাংশ আলিম শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, তাঁদের মাঝে দীর্ঘকাল থেকে তাসাওউফের সিলসিলা অব্যাহতভাবে চলে আসছে আর শাফেয়ী মাযহাবের (পরবর্তী কিছু আলিমের মধ্যে কোনো কোনো) বিদআতের ব্যাপারে কিছু ছাড় আছে-এ কারণে ঐসব তরুণ এখানে এসে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর তাকলীদ এবং তাসাওউফের বিরুদ্ধে তারা কঠোরভাবে বিরোধিতা শুরু করেছে। কেউ কেউ তো এখানকার প্রবীণ আলেমদের মুশরিক পর্যন্ত বলেছে। এর ভিত্তিতে এখানকার মুসলমানদের মাঝে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে।

'এ প্রেক্ষাপটে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্ত্ত ছিল, কমিউনিজমের আধিপত্য ও নির্যাতন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর রাশিয়ার মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিৎ। এ প্রসঙ্গে আমি বললাম যে, আজ রাশিয়ার মুসলমানদের মাঝে যদি ইসলাম ও ইসলামী জীবনপদ্ধতির কোন চিহ্ন বাকি থেকে থাকে তা কেবল প্রবীণ উলামায়ে কেরামের মেহনতের ফসল। যারা কমিউনিস্ট শাসনের অন্ধকার রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইলমে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এবং যারা জীবন ও জীবিকার সকল সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আহার ত্যাগ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করেছেন।

তাই আজকের তরুণসমাজের কর্তব্য, ঐসকল মহীরূহ উলামায়ে দ্বীনের যথার্থ মূল্যায়ন ও সম্মান করা। পাশাপাশি এটা কখনো ভোলা উচিৎ নয় যে, শাখাগত মাসআলায় ইখতেলাফ সব যুগেই ছিল। এ ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কাফের মুশরিক বলে ফতোয়া দেওয়া হলে এতে কেবল ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হবে। আজ তো রাশিয়ার অবস্থা এই যে, ইসলাম ও ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে দমনপীড়নের কারণে সাধারণ মুসলমানদের কাছে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে তাদের কাছে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান পৌঁছানো অবশ্যকর্তব্য।

মুসলমানদের এমন অসহায় পরিস্থিতিতে ‘আরশে সমাসীন হওয়া’, ‘তাকলীদ চলবে, না গাইরে তাকলীদ’-এ জাতীয় মাসআলায় ইখতিলাফ করা হলে দ্বীনের ক্ষতিসাধনে এর চেয়ে বড় কোনো ফেতনা আর হতে পারে না। তাই সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য এটাই যে, তারা প্রবীণ আলেমদের সাথে জুড়ে থাকবেন। কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে আপোসে সমাধা করে নেবেন। কলহ ও কোন্দলের দিকে যাবেন না। (পৃ :১৭৯-১৮০)

আমি নিবেদন করছিলাম যে, বর্তমান সময়ে এটি গোটা মুসলিম জাহানের সমস্যা। এজন্য বিষয়টির সংশোধন অতি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে ইখলাস ও হিম্মত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯১৭

যুবকদের প্রতি শহীদ হাসান আল বান্নার ২০টি উপদেশ

Slave

Junior Member

০৪-২০-২০১৫

যুবকদের প্রতি শহীদ হাসান আল বান্নার ২০ টি উপদেশ:

==========

১. তোমরা যে অবস্থায় থাক না কেন আযান শোনার সাথে সাথে নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে।

২. কোরআনকে পাঠ কর এবং এটা নিয়ে গবেষণা কর। যত কম সময়ই হোক না কেন সেটাকে আজেবাজে কাজে বায় কর না।

৩. সবসময় স্পষ্টবাদী হওয়ার চেষ্টা করো, কেননা এর দ্বারাই প্রমান হবে তুমি যে মুসলিম।
আরবি শিখার চেষ্টা করো, কেননা কেবলমাত্র আরবি ভাষার মাধ্যমেই কুরআনকে ভালোভাবে বুঝা সম্ভব।

৪. কোন বিষয়েই মাত্রারিক্ত তর্কে জড়াবে না। কেননা এটা কোন সময় সফলতা বয়ে না।

৫. কখনোই বেশি হাসবে না কেননা। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আত্মা সবসময় শান্তচিত্ত ও ভারি হয়।

৬. কখনোই মশকরা কর না। কেননা একটি মুজাহিদ জাতি গাম্ভিরতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

৭. শ্রোতা যতটুকুন পছন্দ করে ততটুকুই তোমার আওয়াজকে কর। কেননা এটা স্বার্থপরতা ও অন্যকে নিপীড়ন করার শামিল।

৮. কখনোই কাওকে ছোট কর না। কল্যাণ কর ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে কথা বল না।

৯. তোমার প্রতিবেশী কোন ভাই তোমার সাথে পরিচয় হতে না চাইলেও তার সাথে পরিচিত হও।

১০. আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আমাদের যে সময় দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী।

অন্যজনের সময় বাঁচানোর জন্য সবসময় ব্রত হও। যদি তোমার উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় সেটাকে সব চেয়ে সহজ পন্থায় ও সুন্দর করে করার চেষ্টা কর।

১১. সবসময় পরিষ্কার পরিছন্নতার দিকে নজর দিবে।তোমাদের ঘরবাড়ি; পোশাক পরিচ্ছদ; শরীর ও তোমাদের কাজের জায়গাকে পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা এই দ্বীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরেই নির্মিত হয়েছে।

১২. তোমাদের ওয়াদা; তোমাদের কথা ও কাজে সবসময় মিল রাখবে। শর্ত যাই হোক না কেন সর্বদায় এর উপর অটল অবিচল থাকবে।

১৩.পড়ালেখায় মনোযোগ দাও।

মুসলিমদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন নিয়ে পরস্পর আলোচনা কর।

ছোট করে হলেও নিজস্ব একটা লাইব্রেরি গড়ে তুল।

নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে গভীরজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা কর।

১৪. কখনো সরকারের মুখাপেক্ষী হবে না।

কেননা রিজিক এর সবচেয়ে সংকীর্ণ দরজা হল তাদের দরজা।

তবে তোমাদের কে যদি সুযোগ সুবিধা দেয় সেটাকে প্রত্যাখ্যান কর না।

তোমাদের দাওাতকে ও তোমাদের নিজস্ব গতিকে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত এর থেকে পৃথক হবে না।

১৫. তোমাদের সম্পদের একটা অংশ সংগঠনে দান কর।

আর ফরজ যাকাত একসাথে করে দাও।

সেটার পরিমান যত সল্পই হোক না কেন সেখান থেকে গরীব দুঃখীদের দান কর।

১৬. অপ্রত্যাশিত বিপদ আসার আগেই স্বল্প পরিমান হলেও সম্পদের একটা অংশ কে সঞ্চয় করে রাখ। এবং কখনোয় জাঁকজমক পূর্ণ আসবাব পত্র ক্রয়ে সম্পদ বায় কর না।

১৭. সকল অবস্থায় তাওবা ও ইস্তিগফার পাঠ কর।

রাতে ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট আত্ম সমালোচনা কর।

হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সন্দেহ জনক বিষয় থেকে বেঁচে থাক।

১৮. বিনোদন এর জায়গা থেকে এই ভেবে দূরে থাক যে এর বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম।
সকল প্রকার প্রসন্নতা ও আরাম দায়ক বিষয় থেকে দূরে থাক।

১৯.সকল জায়গায় তোমার দাওয়াত কে বুলন্দ করার চেষ্টা করবে।

নিজের নফস এর সাথে এমন আচরন করুন যাতে সে তোমাকে মেনে চলতে বাধ্য হয়। তোমাদের চোখকে হারাম থেকে বিরত রাখ।

নিজের আবেগ এর উপর প্রাধান্য বিস্তার কর।

২০.নিজেকে সর্বদায় সংগঠন এর কাজের সাথে সম্পর্কিত রাখ এবং একজন নিবেদিত প্রান সেনার মত নেতার আদেশ মানতে সর্বদায় প্রস্তুত থাক।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৮

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান

tayfamansura

Member

১২-২৫-২০১৫

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান

ইসলামের স্তরঃ তিনটি

==========

১। ইসলাম,

২। ঈমান, ও

৩। ইহসান

==========

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৪, হাদিস ৬

যুহাইর ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। সাহাবা কিরাম তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর কাছে বসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! ইসলাম কী? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইসলাম হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ঈমান কী? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, উত্থানের বিষয়ে এবং পুরোপুরি তাকদীরে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর

রাসুল! ইহসান কী? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাকে নাও দেখ; তাহলে ধারণা করবে যে তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামত কখন ঘটবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবহিত নয়। তবে আমি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করছি। যখন দেখবে, দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে, এটা কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, বধির ও মূকেরা দেশের শাসক হয়েছে, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। আর যখন দেখবে, মেষপালক বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত, এটিও কিয়ামতের একটি আলামত। পাঁচটি অদৃশ্য বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কেউ কিছু জানে না। তারপর (তিনি কুরআনুল করীম-এর আয়াত) তিলাওয়াত করলেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর কাছে রয়েছে কিয়ামতের মতের জ্ঞান। তিনি নাযিল করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা রয়েছে মাতৃগর্ভ জানে না কেউ, কি কামাই করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কেউ, কোন মাটিতে (দেশে) সে মারা যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন। (সূরা লুকমানঃ ৩৪) তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেনঃ তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ) তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সমন্ধে জ্ঞান লাভ কর।

ইসলাম

১। ইসলামের রুকণঃ ৫টি

==========

ক। কালিমা/শাহাদাহ, খ। স্বলাত, গ। যাকাত, ঘ। হাজ্জ ও ঙ। সওম

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৪, হাদিস ৬ যুহায়র ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন

কর। সাহাবা কিরাম তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর কাছে বসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! ইসলাম কী? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইসলাম হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা পালন করবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। ---------- ---------- তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেনঃ তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ) তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সমন্ধে জ্ঞান লাভ কর। (হাদিছের অংশ বিশেষ)

সহিহ বুখারী: খন্ড ১: বই ২: ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৭

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রা)..... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১। আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।

২। সালাত কায়েম করা

৩। যাকাত দেওয়া

৪। হজ্জ করা এবং

৫। রমদান এর সিয়াম পালন করা

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৯

আমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন বুকায়র আল নাকিদ (র)...আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে আপনার দুত এসে বলেছে, আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ। আগন্তুক বলল, কসম সেই সত্তার! যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসব পর্বতমালা স্হাপন করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রাসুলরুপে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর দিনে ও রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুলরুপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত দেওয়া ফরয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ঠিকই বলেছো আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুলরুপে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের রোযা পালন করা আমাদের উপর ফরয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তুক বলল, যিনি আপনাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তার কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ। আগন্তুক বলল, আপনার দূত বলে যে, আমাদের মধ্যে যে বায়তুল্লায় যেতে সক্ষম তার উপর হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সত্যি বলেছে। রাবী বলেন যে, তারপর আগন্তুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করব

না। এ কথা শুনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ১৮, হাদিস ১৯, হাদিস ২০, হাদিস ২১

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নু'মায়র আল হামদানী (র).....ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রামাযানের রোযা পালন করা এবং হজ্জ করা। এক ব্যক্তি (এ ক্রম পাচটিকে) বলল, হজ্জ করা ও রামাযানের রোযা পালন করা। রাবী বললেন, না রামাযানের রোযা পালন করা ও হজ্জ করা এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। ----------
---

ক। কালিমা/শাহাদাহ/লা ইলাহা ইল্লালাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এর শর্তঃ ৭টি

==========

লা ইলাহা ইল্লালাহ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আল-কুরআনে ও সুন্নাহতে বর্ণিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ।

a) ইলম/জ্ঞান।

b) ইয়াক্বিন/দৃঢ় বিশ্বাস।

c) ইখলাস/ নিখাদচিত্তার প্রমাণ।

d) সিদক্/ সত্যবাদিতা।

e) হুব/ ভালবাসা।

f) আসলাম/আত্মসমর্পণ।

g) কবুল/ মেনে নেয়া।

বিস্তারিতঃ
শাহাদাহর সাতটি শর্ত

==========

নামাযের মত তাওহীদেরও অনেকগুলো শর্ত আছে। নামায সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি যে কোনো একটি শর্ত যেমন অজু করা বা কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। তেমনি শাহাদাহ্ সাতটি শর্ত সম্বলিত, যা পরিপূর্ণভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর আমাদের মাঝে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ (ঈমান) স্থাপিত হওয়ার দাবী করতে পারব। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এর শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াযিব।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেনঃ- ইহা কি সত্য যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষ্যদানই বেহেস্তে প্রবেশের চাবিকাঠি? তিনি বললেন হ্যাঁ ঠিক। তবে প্রত্যেক চাবিতেই কিছু দাঁত থাকে এবং দাঁত ব্যতীত কাংখিত দরজাটি খোলা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কালেমারও সাতটি দাঁত রয়েছে এবং আমাদের জীবনে এর যে কোন একটির অভাব ঈমানের দাবীকে পরিপূর্ণ করে না এবং এর ফলে শাহাদাহ অকার্যকর (বাতিল) হয়ে পড়ে।

প্রথম শর্ত: ইলম বা জ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "তুমি জেনে রাখো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।" (মুহাম্মদ:১৯) [তাওহীদের] এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের প্রথম শর্ত নিধারণ করা হয়েছে।

কালেমার শব্দসমূহের জ্ঞান অর্জন: কালেমা দু'টি অর্থপূর্ণ বাক্যের সমষ্টি আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ (রব) নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। কালেমার প্রথম অংশকে "তাওহীদ" ও দ্বিতীয় অংশকে "রিসালাত" বলা হয় উভয় অংশে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

তাওহীদের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে ও মানতে হবে:

(১) আল্লাহই একমাত্র রব। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র অনন্তকাল থাকবেন। তিনি একমাত্র অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন (আলেমুল গায়েব) । তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা ও নিরাপত্তাদানকারী। তিনিই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনিই মাতৃগর্ভে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত। তিনিই জানেন কখন বৃষ্টি হবে। তিনিই জানেন মানুষ আগামীকাল কি উপার্জন করবে। তিনিই সবার মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারণকারী। আল্লাহর এই গুণাগুণসমূহ সামগ্রিকভাবে 'তাওহীদ আল-রুবুবিয়াহর' অন্তর্গত।

যদি কেউ এই ধারনা পোষণ করে যে আমেরিকা বা জাতিসংঘ (ইউ, এন) তার নিরাপত্তা বিধান করবে অথবা তার ব্যবসা বা তার মনিব বা সরকার তাকে রিযিক দিবে, জ্যোতিষ বা ভাগ্যগণনাকারী তার ভবিষ্যত বলে দিবে; তাহলে সে "তাওহীদ আর রুবুবিয়াহকে" অস্বীকার করল।

(২) একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা (হুকুমের অনুসরণ) যাবে না। সকল ইবাদত (যেমন নামায, রোযা, কোরবানী বা ত্যাগ) কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। যদি কেউ কোন পূণ্যবান মৃত ব্যক্তি বা কবরের (মাজার) কাছে অথবা কোন ধর্মীয় নেতার (পীর, ফকির) কাছে তার মনের আকাঙ্খা পুরণের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের নিকট সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে তবে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করলো। যা একটি প্রকাশ্য কুফুরী এবং 'তাওহীদ আল উলুহিয়ার' পরিপন্থী। অন্য কথায়, ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী একমাত্র কুরআন ও সুনড়বাহর আলোকে পরিচালিত হতে হবে। যদি আমরা মনে করি যে, আল্লাহর আইন (শরীয়াহ) যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খিলাফায়ে রাশেদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সেকেলে, অপ্রয়োজনীয়, নিকৃষ্ট এবং আল্লাহর আইনের (শরীয়াহ) তুলনায় ব্রিটিশ বা আমেরিকান আইন বা অন্য যে কোন মতাদর্শ বা জীবনব্যবস্থা (যেমন-গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ইত্যাদি) এগুলির যে কোনটি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তাহলে এই ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা কার্যকর হবে না।

(৩) আমরা জানি যে, আল্লাহর নিরানব্বইটি সুন্দর নাম রয়েছে যার প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর গুণ-সমূহকে প্রকাশ করে। এই গুণবাচক নামসমূহের প্রত্যেকটির উপর ঈমান আনা ফরয। এই নামসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনই 'তাওহীদ আল-আসমা আল সিফাত'।

সুতরাং আমরা যদি তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ এর মাঝে পার্থক্য বুঝতে চাই তাহলে এই উদাহরণটি বোঝার চেষ্টা করি,

আল্লাহ ছাড়া আর কোন আইন্ দাতা বা বিধান দাতা নেই এটি হল তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ এর অংশ, আর আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোন আইন দিয়ে বিচার করা যাবে না এটি হল তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ্ এর অংশ। সুতরাং তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আর তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ বান্দার আনুগত্য ও কাজের সাথে সম্পর্কিত।

প্রত্যেককেই রিসালাত সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মানতে হবে:

• (১) আমাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

• (২) সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ বলে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক অনুমোদিত। "সে [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] মনের ইচ্ছায় বলে না। কোরআন অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।" (আন-নাজম: ৩-৪) সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

• (৩) আমাদেরকে এই বিষয়টি মানতে হবে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্বজগতের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

• (৪) আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সবকিছু (ব্যক্তি ও বস্তু) অপেক্ষা বেশি ভালবাসতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত

মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান এবং সমগ্র মানবকুল অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল না বাসবে। [সহীহ্ আল বুখারী/সহীহ্ মুসলিম]

দ্বিতীয় শর্ত: (আল-ইয়াক্বীন) নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন।

আমাদেরকে অবশ্যই শাহাদার প্রথম শর্তের [তাওহীদ ও রিসালাত] উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, তাকদীর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারেও কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধাচারণ করা যাবে না। 'যে আল্লাহ ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালকে অবিশ্বাস করে সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।' (নিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩৬)

আমাদেরকে আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় ঈমান আনতে হবে যেরূপ তিনি 'ইস্রা' ও 'মিরাজের' ব্যাপারে ঈমান এনেছিলেন। একদা আবু জেহেল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেউ যদি তোমাকে এরূপ বলে যে, সে একরাতে মাসজিদুল আকসা, সাত আসমান, বেহেস্ত, দোযখ পরিভ্রমণ শেষে আবার ঐ রাতেই মক্কায় ফিরে এসেছে তবে তুমি কি তার কথা বিশ্বাস করবে? আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন অবশ্যই নয়। তখন আবু জেহেল বলল যদি তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এইরূপ কথা বলে? এর জবাবে আবু বকর (রাঃ) বললেন যদি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এইরূপ কথা বলে থাকেন তবে ইহা অবশ্যই সত্য এবং নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি। এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আল-সিদ্দিক (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভুষিত করেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন সন্দেহের বেড়াজাল থেকে মুক্ত এবং এভাবেই আমাদের দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করতে হলে এরূপ বিশ্বাসী হতে হবে।

"প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। শুধুমাত্র তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।" (আল-হুজরাত: ১৫)

তৃতীয় শর্তঃ (আল-কবুল) প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঈমানের স্বীকৃতি।

আমাদের অবশ্যই তাওহীদ ও রিসালাতের (শর্ত ০১) ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং যে কোন প্রেক্ষাপটের মোকাবেলায় মৌখিক স্বীকৃতি দান ও বাহ্যিকভাবে মেনে নিতে হবে। কেবলমাত্র অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনই যে যথেষ্ট নয় এবং মৌখিক ও বাহ্যিক স্বীকৃতিও প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক তা আবু তালেবের জীবনী থেকে জানা যায়। যিনি (আবু তালেব) অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কোরাইশ নেতাদের সম্মুখে 'কালেমা শাহাদার' মৌখিক স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ বিচারের দিনে তাকে (আবু তালেব) জাহান্নামের উত্তপ্ত জুতা পরানো হবে।

আল-কবুল বা গ্রহণ হচ্ছে প্রত্যাখ্যানের বিপরীত এবং কুরআনে গ্রহণের প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর (তায়ালা) এই কথা: "সত্যিই তাদেরকে যখন বলা হত: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই।)" তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত। বলতঃ "আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মাবুদদের ত্যাগ করব।" (আস-সাফফাত ৩৫-৩৬)

চতুর্থ শর্ত: (আল-ইনকিয়াদ বা আত্মসমর্পণ) কুরআন ও সুন্নাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।
আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিছু আয়াত মানা এবং বাকী আয়াত অমান্য করা যাবে না। অন্যথায় আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে যা ইয়াহুদীদের হবে। যারা এরূপ করত এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন।

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে।" (আল বাকারাহ: ৮৫)

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে

তার নিজের কামনাবাসনাকে আমার আনীত শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে দেয়।" [সহীহ আল বুখারী]

কুরআন থেকে আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রমাণ এই কথা: "ফিরে এস (অনুতপ্ত হয়ে) তোমাদের রবের দিকে এবং আত্মসমর্পণ কর তার ইচ্ছার কাছে।" (আয-যুমার: ৫৪)

পঞ্চম শর্ত: সত্যবাদীতা বা আল-সিদক।

সেই সত্য যা মিথ্যা বা মুনাফেকী কোনটাই অনুমোদন করে না। এই সত্যের প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী: "আলিফ লাম মীম। লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এইটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"(আন-কাবুত: ১,২,৩)

যে ব্যক্তি এ কলেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কলেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত [মুক্তি] লাভ করতে পারবেনা, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবেনা।

"আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলেঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (মুনাফিকুন: ১)

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেনঃ "আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।" (আল-বাকারাহ: ৮)

ষষ্ঠ শর্ত: আল-ইখলাস বা অন্তরে একাগ্রতা।

নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। প্রতি নামাযে আমরা সূরা ফাতিহার এই কথারই স্বীকৃত দেই যে, "আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই।" [আল ফাতিহা: ০৪] এই আয়াত থেকে বুঝা যায়

যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতই করি না সাথে সাথে তাঁর উপর পূর্ণ তাওক্কুল (ভরসা) করি। নিয়তের বিশুদ্ধতা (ইখলাস আল নিয়্যাহ) ইবাদত কবুলের জন্য অপরিহার্য। একটি হাদীসে আছে যে, "বিচার দিবসে তিন ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের একজন হবে আলেম, একজন দানশীল ও একজন শহীদ। তারা জাহান্নামবাসী হবে এই কারণে যে, তাদের কর্মকান্ড আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল না বরং তা ছিল লোক দেখান (রিয়া)।" সুতরাং আমাদের ইবাদতসমূহ রিয়ামুক্ত করতে হবে কারণ রিয়াকারীর আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

সপ্তম শর্ত: (আল-মুহাব্বাত)আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। (আল ওয়ালা এবং ওয়াল বারা):

আমাদের যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হবে এবং তাঁর জন্যই ঘৃণা করতে হবে। ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঘটনা এর (আল ওয়ালা এবং আল বারা) উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতা আযরের মিথ্যা প্রভুদের অস্বীকার করে বলেছিলেন "তোমার ও আমার বিরোধ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।" সুতরাং মু'মিনকে অবশ্যই হক (সত্য) ভালবাসতে হবে এবং বাতিল (মিথ্যা) ঘৃণা করতে হবে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, “বিচার দিবসে সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ করবে, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাদের একজন হল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর জন্য কারো সঙ্গে মিলিত হত এবং আল্লাহর জন্য বিচ্ছিন্ন হত।" [সহীহ আল বুখারী]

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের জীবনী থেকেও হকের প্রতি ভালবাসা এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণার ভুরিভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যুদ্ধের ময়দানে নিঃর্দ্বিধায় কাফের পিতা বা পুত্রকে হত্যা করে অনেক সাহাবী এর যথাযথ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন কারণ তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসতেন বা ঘৃণা করতেন।

"মানব জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি) কে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ ভালবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।" (আল-বাকারাহ: ১৬৫)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যারই নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকবে সেই ঈমানের মাধূর্য লাভ করবে: (১) তার কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ভাল না বাসবে। (যখন কাউকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে) (৩) অবিশ্বাসের (কুফর) দিকে প্রত্যাবর্তনকে ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করেছে এবং সে দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া ঘৃণা করে।" [মুসলিম]

মুসলমান হওয়ার জন্য উপরোক্ত সাতটি শর্ত প্রত্যেককে নিজের জীবনে কার্যকর করতে হবে।

কালিমা/শাহাদাহ/লা ইলাহা ইল্লালাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ দুটি ভাগ।

i) লা ইলাহা ইল্লালাহ।

ii) মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

তাওহীদের তথা লা ইলাহা ইল্লালাহ'র মৌলিক উপাদান বা রুকণঃ ২টি।

==========

i) ইমানবিল্লাহ/ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও

ii) কুফর বিত তাগুত/ তাগুতের বিরদ্ধাচারন/ অস্বীকার করা।

---

ii) কুফর বিত তাগুত/ তাগুতের বিরদ্ধাচারণ/ অস্বীকার করাঃ –

==========

মহান আল্লাহ বান্দার উপর ফরয করেছেন যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয়, এবং এটাই হলো সেই তাওহীদ যা ছিল সকল নবীগণের (عليهم السلام) দাওয়াতের মূল বিষয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

আর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” হলো পবিত্র কালিমা তাওহীদ যার উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে দ্বীন ইসলাম। একথা জানা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির উপর সর্বপ্রথম যা ফরয করেছেন তা হচ্ছে তাগুতের সাথে কুফরী এবং আল্লাহর উপর ঈমান।

অর্থাৎ,
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর রুকন বা ভিত্তি দু’টো:

১। কুফর বিৎ* তাগুত

২। ঈমান বিল্লাহ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।” (সূরা নাহল: ৩৬)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ
“যারা তাগুতের পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।” (সূরা যুমার: ১৭)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“সুতরাং যে তাগুতের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে এমন মজবুত রজ্জুকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে যার কোন বিভক্তি বা চিড় নেই, আর আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্ব জ্ঞানী।” (সূরা বাকারা: ২৫৬)

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।” (সূরা বাকারা: ২৫৭)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে জিবত ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।” (সূরা নিসা: ৫১)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে হয়েছে সে বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।” (সূরা নিসা: ৬০)

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” (সূরা নিসা: ৭৬)

তাগুতের সাথে কুফরীর ধরন হলো:

“লা ইলাহা”—“নেই কোন ইলাহ” বাক্যটি নেতিবাচক; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর উপাসনা (ইবাদত) বাতিল বলে বিশ্বাস করা, তা ত্যাগ করা, ঘৃণা ও অপছন্দ করা, এবং যারা তা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনকিছুর উপাসনা) করবে তাদের অস্বীকার করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি আল হানাফী (**رحمه الله**) বলেন, “হযরত (**صلي الله عليه و سلم**) এর কুফর ও শিরক বিরোধী প্রকাশ্য ঘোষনা এবং মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘৃণার দরুন তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের (**رضي الله عنهم**) তীব্র শত্রুতা ও বিরোধীতার মুখে অটল থাকা এ বিষয়েরই প্রকাশ্য প্রমাণ যে, ঈমান এবং ইসলামের জন্য কেবল অন্তরে সত্যায়ন অথবা মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং কুফর ও কাফের এবং শিরকের বৈশিষ্ট্য ও আনুষঙ্গিকতার বিরোধীতাও জরুরি এবং সেগুলো অপছন্দ করাও অত্যাবশ্যক।” (সিরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ১/১৫৫)

তিনি (**رحمه الله**) আরও বলেন, “মহান পয়গম্বর (**عليهم السلام**) গণের সুন্নাহ তথা আদর্শ তো এটাই যে, যেভাবে তাঁরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ইমান ও সত্যায়নের আহবান জানান, ঠিক তেমনিভাবে কুফর, শিরক ও তাগুতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকারের আহবান জানান।” (সিরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ১/১৫৬)

আর আল্লাহর উপর ঈমানের অর্থ হলো:

দ্বিতীয় রুকন 'ইল্লাল্লাহ' হলো ইতিবাচক। অর্থাৎ শিরকমুক্ত শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার অংগীকার।

আল্লাহ তাআলাই কেবলমাত্র হক উপাস্য ও ইলাহ, অন্য কেউ নয়—একথা বিশ্বাস করা, আর সবরকম ইবাদতকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা যাতে এর কোন অংশ অন্য কোন উপাস্যের জন্য নির্দিষ্ট না হয়; আর মুখলিস বা নিষ্ঠাবানদের ভালবাসা, তাদের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা, মুশরিকদের ঘৃণা ও অপছন্দ করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা।

আর এটাই হলো ইবরাহীম (عليه السلام) এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন বা মিল্লাত, যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হবে সে তো স্বয়ং নিজেকেই বোকা বানাবে, আর এটাই হলো সে আদর্শ (أسوة) যার কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীতে বলেছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা বজায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।" (সূরা মুমতাহিনা: ৪)

তাগুত এর আভিধানিক সংজ্ঞা:

তাগুত শব্দের অর্থ হচ্ছে সীমালংঘনকারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। তাগুত শব্দটি আরবী (তুগইয়ান) শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, স্বেচ্ছাচারিতা।

তাগুত শব্দের শর'য়ী সংজ্ঞা:

#উমর (رضي الله عنه) বলেন, "জিবত শব্দের অর্থ হচ্ছে যাদু এবং তাগুত শব্দের অর্থ হচ্ছে শয়তান।" (তাফসীরে ইবন কাসির-২/৪৪৪, সূরা নিসা: ৫১ এর তাফসীর, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: ২/৪১৩)

#জাবির (رضي الله عنه) তাগুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, "তারা ছিলো যাদুকর এবং তাদের কাছে শয়তান আসতো।" (তাফসীরে ইবন কাসির-২/৪৪৪, সূরা নিসা: ৫১ এর তাফসীর)

#মুজাহিদ (رحمه الله) বলেন, "তারা হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান। তাদের কাছে মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে নেয়।" (তাফসীরে ইবন কাসির-২/৪৪৪, সূরা নিসা: ৫১ এর তাফসীর)

#ইমাম মালেক (رحمه الله) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়, এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়।" (ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শওক্বানী)

#ইমাম ইবনে জারির তাবারি আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "আমাদের মতে সঠিক মত হলো, আল্লাহর উপর সীমালংঘনকারী মাত্রই তাগুত বলে চিহ্নিত, যার অধীনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান কিংবা মূর্তি কিংবা প্রতিমা অথবা অন্য যেকোন কিছুর হতে পারে।" (তাফসীর আৎ* তাবারি, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম খন্ড, সূরা বাকারা: ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)

#ইমাম ইবন জারির তাবারি আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানী করে সীমালংঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আনুগত্য করে। সে মানুষ, জ্বিন, শয়তান, প্রতিমা বা অন্য কিছুও হতে পারে।" (তাফসীর আৎ* তাবারি: ৩/২১)

#ইমাম নববী আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তারাই তাগুত। এটাই লাইস, আবু উবাইদা, কেসায়ি এবং বেশীরভাগ আরবী ভাষাবিদদের অভিমত।" (শরহে মুসলিম: ৩/১৮)

#ইমাম কুরতুবি আল-মালেকী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত হচ্ছে গণক, যাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা।" (আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: ৩/২৮২)

#ইমাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাম্বলী (رحمه الله) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তারাই তাগুত, যদি তারা তাদের এই ইবাদতে অসন্তুষ্ট না হয়। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (صلي الله عليه و سلم) মূর্তিকে তাগুত বলেছেন।" (মাজমাআতুল ফাতাওয়া: ২৮/২০০)

#ইমাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাম্বলী (رحمه الله) বলেন, "আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়।" (মাজমাআতুল ফাতাওয়া: ৭০১/৭৮)

#ইমাম ইবনে কাসীর আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "হযরত উমরের (رضي الله عنه) তাগুতের অর্থ শয়তান নেয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা সমস্ত খারাপ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলো অজ্ঞতার যুগের লোকদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। যেমন প্রতিমার পূজা, তাদের কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।" (তাফসীর ইবনে কাসির ১/৭১৪, সূরা বাকারা: ২৫৬ এর তাফসীর)

#ইমাম ইবনে কাসীর আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে, যে কিতাব ও সুন্নাহকে ছেড়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফায়সালা নিয়ে যায়। এখানে এটাই হচ্ছে তাগুতের ভাবার্থ।" (তাফসীর ইবনে কাসির ২/৪৬৩, নিসা: ৬০ এর তাফসীর)

#ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-হাম্বলী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত হচ্ছে এমন যে কেউ যার প্রতি বান্দা (আবদ) সীমালংঘন করে, সেটা কাউকে ইবাদত করা (মা'বুদিন) বা অনুসরণ করা (মাতবুইন) বা মান্য করা (মুতাইন) যাই হোক না কেন।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিইন)

#ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-হাম্বলী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, নেতা, মুরব্বি যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয়, অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করা হয়, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয় এরাই হলো পৃথিবীর বড় বড় তাগুত। তুমি যদি এই তাগুতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো তবে বেশীরভাগ মানুষকেই পাবে যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাগুতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য করে।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিইন: ১/৫০)

#ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-হাম্বলী (رحمه الله) তাগুতকে ৫ টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১. শাইতন বা শয়তান।

২. যার ইবাদত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট।

৩. যে অপরকে তার ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করতে আহবান করে বা ডাকে।

৪. যে গায়েব বা অদৃশ্য-এর জ্ঞান জানার দাবি করে।

৫. যে আল্লাহ্* যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করে। (মাদারিজুস-সালিকিন)

#শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-হাম্বলী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, নেতা, মুরব্বি, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট থাকে।" (মাজমাআতুত-তাওহীদ: ৯) শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-হাম্বলী (رحمه الله) তাগুতকে ৫ টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, কিন্তু ৫ম ভাগটিতে পার্থক্য রয়েছে।

১. শাইতন বা শয়তান।

২. যে আল্লাহ্* যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অপর কিছু দিয়ে বিচার করে।

৩. যে আল্লাহ্*র পাশাপাশি গইব বা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে।

৪. যার 'ইবাদাত/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং সে এটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

৫. সেই অত্যাচারী বিচারক, যে আল্লাহ্*র বিচারে পরিবর্তন করে। (আদ-দারার আস-সুন্নিয়্যাহ, ভলিউম: ০১, পৃষ্ঠা: ১০৯-১১০)

#আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি আল-হানাফী (رحمه الله) বলেন, "হযরত শাহ সাহেব [মাওলানা শাহ আব্দুল কাদির দেহলাবি আল-হানাফী (رحمه الله)] বলেন, 'তাগুত হচ্ছে তারা, যারা ভিত্তিহীনভাবে নের্তৃত্বের দাবি করে। প্রতিমা, শয়তান, স্বেচ্ছাচারী শাসক সবই এর অন্তর্ভুক্ত।'" (তাফসীরে উসমানিঃ২/৫৪৫)

#মুফতি মুহাম্মাদ শফি আল-হানাফী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগুত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের কাছে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা হয় এই কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল শয়তান কিংবা এই কারণে যে, শরীয়তের ফায়সালা বর্জন করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া, শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুত যে লোক সেই শিক্ষার অনুসরণ করেছে, শয়তানের কাছেই সে যেন নিজের মোকাদ্দমা নিয়ে গেছে।" (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: ২/৪৩৯-৪৪০)

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "তাগুত বলতে সেইসব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত বা তাঁর দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে উদ্ভূত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা পরিচালনা করে।" (তাফসীরে ফী যিলালিল কোরআন)

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ আশ-শাফেয়ী (رحمه الله) বলেন, "যারা সত্যকে অমান্য করে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করে, আল্লাহর দেয়া শরীয়তের কোন তোয়াক্কা করে না, ইসলামি আক্বীদাহ-বিশ্বাসের কোন গুরুত্ব রাখে না, যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন ছাড়া ইবাদতের পদ্ধতি তৈরি করে, যারা বিশেষ প্রকার ধ্যান করা অথবা বিশেষ ভঙ্গিমা অথবা কোন ইবাদতের বিশেষ আদব তৈরি

করে তারা সকলেই তাগুত। এমনিভাবে যারা বিশেষ কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণে জনসাধারণকে বাধ্য করে তারাও তাগুত।" (তাফসীরে ফী যিলালিল কোরআন: ১/২৯২)

#শাইখ মুহাম্মাদ আমিন শানকিত্বি আল-মালেকী (رحمه الله) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তারাই তাগুত। আর এই গাইরুল্লাহর ইবাদতের বড় অংশটাই হচ্ছে শয়তানের জন্য। কেননা শয়তানের আহবানে সাড়া দিয়ে কোন গাইরুল্লাহর ইবাদাত করা পরোক্ষভাবে শয়তানেরই ইবাদতের শামিল। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন: 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে শয়তানের ইবাদাত করোনা?' (সূরা ইয়াসিন: ৬০)" (তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান: ১/২২৮)

#মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক আল-হানাফী (حفظه الله) বলেন, "'তাগূতের অর্থ আল্লাহর ঐ বিদ্রোহী বান্দা, যে আল্লাহর মোকাবেলায় নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের উপর তা কার্যকর করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে কোন তাগুত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দ্বীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন 'ধর্ম', যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয়না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর উপাসনার পাশাপাশি তাগুতের উপাসনা বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্রুপ আল্লাহর দ্বীনের মোকাবেলায় বা তার সাথে তাগূতের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগূত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ঈমানের দাবি নিফাক ও মুনাফিকী।" (ঈমান সবার আগে-৩, মাসিক আল-কাউসার মে-২০১৩)

#মাওলানা মুহাম্মাদ মাসউদ আযহার আল-হানাফী (حفظه الله) বলেন,
১। ইসলাম বিরোধী প্রত্যেক শক্তির নামই তাগুত।

২। তাছাড়া, তাগুত হলো সেইসব ব্যক্তি যারা মানুষকে সত্য দ্বীন থেকে বিপথগামী করে-হোক সে মানুষ অথবা জ্বীন।

৩। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে-সেই ধরনের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাগুত।

৪। তাগুত হলো সেইসব সিস্টেম বা পদ্ধতি যার ছত্রছায়ায় কুচক্রী মানুষগুলো একত্রিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষরযন্ত্রে লিপ্ত থাকে অথবা যুদ্ধ করে।

৫। আরো, তাগুত হচ্ছে সেইসব প্রতিষ্ঠানের নাম যেখানে সত্য দ্বীন বিরোধী নিত্য-নতুন বিভাগ ও ফিরকার উদ্ভব ঘটে।

৬। শয়তান এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোকে (হোক মানুষ অথবা জ্বিন) তাগুতের প্রধান অর্থ বুঝালেও, এর পাশাপাশি তাগুত হচ্ছে পৃথিবীর সেইসকল ক্ষমতাসীন মানুষ যারা তাদের সমস্ত বাতিল শক্তির মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে, ইসলামি শরীয়তের আইনের বাস্তবায়নকে রুদ্ধ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে। (আল্লাহই ভালো জানেন) (ফাতহুল জাওয়াদ ফী মা'আরিফ আয়াতুল জিহাদ, পৃ: ৩৭৫-৩৭৬)

মনে রাখা দরকার কোন মানুষ তাগুতের উপর কুফরী ছাড়া ইমানদার হতে পারেনা।

মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"সুতরাং যে তাগুতের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে এমন মজবুত রজ্জুকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে যার কোন বিভক্তি বা চিড় নেই, আর আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্ব জ্ঞানী।" (সূরা বাকারা: ২৫৬)

এ আয়াতের পূর্বাংশে আল্লাহ বলেছেন, "বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পথ, ভ্রান্ত-পথ থেকে স্পষ্ট হয়েছে।" "বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন পথ" বলতে রাসূল (**صلي الله عليه و سلم**) এর দ্বীনকে, আর "ভ্রান্ত-পথ" বলতে আবু জাহলের দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে, আর এর পরবর্তী আয়াতের মজবুত রশি বা রজ্জু দ্বারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য প্রদানকে বুঝিয়েছেন।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এই কালিমা কিছু জিনিসকে নিষেধ করে, এবং কিছু বস্তুকে সাব্যস্ত করে; সকল প্রকার ইবাদতকে আল্লাহর ছাড়া অন্যের জন্য নির্ধারিত হওয়াকে নিষেধ করে। শুধুমাত্র লা-শরীক আল্লাহর জন্য সকল প্রকার ইবাদতকে নির্দিষ্ট করে।

প্রধান প্রধান তাগুত

আর এ তাগুত -এর সংখ্যা অত্যধিক; তবে প্রধান-প্রধান তাগুত হলো পাঁচটি:

এক: শয়তান:

যে আল্লাহর ইবাদত থেকে মানুষকে অন্য কিছুর ইবাদতের দিকে আহবান করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী: “হে আদম-সন্তান, আমি কি তোমাদের থেকে শয়তানের ইবাদত না করার অঙ্গিকার নিই নি? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” [সূরা ইয়াসিন: ৬০]

দুই: আল্লাহর আইন (হুকুম) পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক:

এর প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা মনে করে আপনার কাছে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছে, তারা তাগুতকে বিচারক হিসাবে পেতে আকাঙ্ক্ষা করে অথচ তাদেরকে এর (তাগুতের) সাথে কুফরির নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শয়তান তাদেরকে সহজ সরল পথ থেকে অনেক দুর নিয়ে যেতে চায়।” [সূরা আন্নিসা ৬০]

তিন: আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ (আইনের) হুকুমের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী: আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুসারে বিচার করে না তারা কাফের।” [সূরা আল মায়েদা: ৪৪]

চার: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন গায়েবের খবর রাখার দাবিদার:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “তিনি গায়েবের জ্ঞানে জ্ঞানী, সুতরাং তার অদৃশ্য জ্ঞানকে কারও জন্য প্রকাশ করেন না, তবে যে রাসূল এর ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট

তিনি তাকে তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে হিফাজত করেন।" [সূরা আল-জিন: ২৬, ২৭]

অন্য আয়াতে বলেন: "আর তার কাছেই সমস্ত অদৃষ্ট বস্তুর চাবিকাঠি, এগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না, তিনি জানেন যা ডাঙ্গায় আছে আর যা সমুদ্রে আছে। যে কোন (গাছের) পাতাই পতিত হয় তিনি তা জানেন, জমিনের অন্ধকারের কোন শস্য বা কোন শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু সবই এক প্রকাশ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

পাঁচ: আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর তাদের থেকে যে বলবে- আল্লাহ ব্যতীত আমি উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নাম দ্বারা পরিণাম ফল প্রদান করব, এভাবেই আমি অত্যাচারীদের পরিণাম ফল প্রদান করে থাকি"। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৯]

মনে রাখা দরকার কোন মানুষ তাগুতের উপর কুফরি ছাড়া ইমানদার হতে পারেনা, আল্লাহ বলেন:

"সুতরাং যে তাগুতের সাথে কুফরি করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে এমন মজবুত রজ্জুকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে যার কোন বিভক্তি বা চিড় নেই, আর আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্ব জ্ঞানী।" [সূরা আল-বাকারা: ২৫৬]

এ আয়াতের পূর্বাংশে আল্লাহ বলেছেন যে, "বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পথ, ভ্রষ্ট-পথ থেকে স্পষ্ট হয়েছে"। 'বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন পথ' বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনকে, আর 'ভ্রান্ত-পথ' বলতে আবু জাহলের দীন, আর এর পরবর্তী আয়াতের 'মজবুত রশি বা রজ্জু' দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (বা আল্লাহ ছাড়া হক কোন উপাস্য নেই) এ সাক্ষ্য প্রদানকে বুঝিয়েছেন।

ঈমান

====

২। ঈমান এর শাখা ৭০টিরও বেশী;

i) সর্বপ্রথমঃ লা ইলাহা ইল্লালাহ ও সর্বশেষঃ কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া।

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৫৫

উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও আবদ ইবন হুমায়দ (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৫৬

যুহাইর ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি ।অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে "আল্লাহ ব্যাতিত ইলাহ নেই" এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে-; রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।

সহিহ বুখারী: খন্ড ১: বই ২: ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন জু'ফী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশি। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

ইবনে হিব্বান (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঈমানের শাখাগুলো হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শাখাগুলো তিন প্রকার। যথা:

(১) এমন কিছু শাখা আছে যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

(২) কতিপয় শাখা জবানের সাথে সম্পৃক্ত এবং

(৩) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, শরীরের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথমতঃ অন্তরের কাজসমূহ

নিয়ত ও বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের কাজ। ঈমানের যেসমস্ত শাখা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তার সংখ্যা ২৪টি। নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর যাত (স্বত্তা), সিফাত (গুণাবলী) এবং একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। তবে স্মরণ

রাখা জরুরী যে, আল্লাহ্ স্বীয় সত্বা ও গুণাবলী কোন সৃষ্টির মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি শুনেন এবং দেখেন"। (সূরা শুরাঃ ১১)

(২) এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুই ধ্বংসশীল।

(৩) এমনিভাবে আল্লাহর ফেরেশতা।

(৪) আসমানী কিতাব।

(৫) নবী-রাসূল।

(৬) তাকদীরের ভালমন্দ ।

(৭) আখেরাতের প্রতি ঈমান। কবরের প্রশ্নোত্তর, পুনরুত্থান, হিসাব, আমলনামা প্রদান, মীযান (দাঁড়িপাল্লা), পুলসিরাত, জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করাও অন্তরের কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

(৮) আল্লাহকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ঘৃণা করা।

(৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা ও তাঁকে সম্মান করাও অন্তরের কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরূদ পাঠ ও তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তার অন্তর্ভূক্ত।

(১০) তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা।

(১১) একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর এবাদত করা আবশ্যক-এর প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তরের কাজের অন্তর্ভূক্ত। রিয়া তথা লোক দেখানো আমল ও মুনাফেকী পরিহার করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(১২) তাওবা করা।

(১৩) আল্লাহকে ভয় করা।

(১৪) আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।

(১৫) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

(১৬) ওয়াদা অঙ্গিকার পূর্ণ করা।

(১৭) ধৈর্য ধারণ করা।

(১৮) তাকদীরের লিখনের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(১৯) আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(২০) বিনয়-নম্রতা প্রদর্শ করা, বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(২১) অহঙ্কার ও তাকাব্বুরী বর্জন করা।

(২২) হিংসা বর্জন করা।

(২৩) কাউকে ঘৃণা না করা ।

(২৪) ক্রোধ বর্জন করা।

দ্বিতীয়তঃ জবানের কাজসমূহ তথা জবান দ্বারা উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যসমূহ ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক জবানের সাথে তার সংখ্যা হল সাতটি। যথা:

(১) তাওহীদের বাক্য অর্থাৎ মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করা।

(২) কুরআন তেলাওয়াত করা।

(৩) ইলম শিক্ষা করা।

(৪) অপরকে ইলম শিক্ষা দেয়া।

(৫) দু'আ করা।

(৬) যিকির করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(৭) অযথা কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয়তঃ শরীরের কাজসমূহ।

ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক শরীরের সাথে, তার সংখ্যা হল ৩৮টি। এ শাখাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:

(ক) কতিপয় শাখা ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা পনেরটি। যথা:

(১) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করা।

(২) মিসকীন ও অসহায়কে খাদ্য দান করা।

(৩) মেহমানের সম্মান করা।

(৪) ফরজ রোজা পালন করা।

(৫) নফল রোযা পালন করা।

(৬) ইতেকাফ করা।

(৭) লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা।

(৮) হজ্জ পালন করা।

(৯) উমরা পালন করা।

(১০) কাবা ঘরের তাওয়াফ করা।

(১১) দ্বীন ও ঈমান নিয়ে টিকে থাকার জন্যে দেশ ত্যাগ।

(১২) দ্বীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্যে কাফের রাষ্ট্র ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে চলে যাওয়া।

(১৩) মানত পূর্ণ করা।

(১৪) ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করা ।

(১৫) কাফ্ফারা আদায় করা।

(খ) কতিপয় শাখা আছে, যা ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা মোট ৬টি। যথা:

(১) বিবাহের মাধ্যমে চরিত্র পবিত্র রাখা।

(৬) পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

(৩) পিতা-মাতার সেবা করা,তাদের অবাধ্য না হওয়া।

(৪) সন্তান প্রতিপালন করা।

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

(৬) মনিবের প্রতি অনুগত থাকা ও অধীনস্তদের সাথে নরম ব্যবহার করা।

(গ) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, যা সকল মুসলমানের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১৭টি। যথা:

(১) ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

(২) মুসলিম জামাআতের অনুসরণ করা।

(৩) শাসকদের আনুগত্য করা।

(৪) মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(৫) সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(৬) দণ্ডবিধি কায়েম করা।

(৭) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়াও জেহাদের অন্তর্ভূক্ত।

(৮) আমানত আদায় করা এবং গণীমতের মালের পাঁচভাগের একভাগ আদায় করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

(৯) ঋণ পরিশোধ করা।

(১০) প্রতিবেশীর সম্মান করা।

(১১) মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

(১২) হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করা এবং বৈধ পন্থায় তা খরচ করা এবং অপচয় না করা।

(১৩) সালামের উত্তর দেয়া।

(১৪) হাঁচি দানকারীর উত্তর প্রদান করা।

(১৫) মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা।

(১৬) খেল-তামাশা থেকে বিরত থাকা ।

(১৭) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেয়া।

এই হল ঈমানের ৬৯টি শাখা। কতিপয় শাখাকে অন্য শাখার সাথে একত্রিত গণনা না করে আলাদাভাবে হিসাব করলে ৭৭টি হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

ii) ঈমান এর রুকণঃ ৬টি

==========

a) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

b) মালাইকা/ ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

c) নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

d) কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

e) আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

f) তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৪, হাদিস ৬

যুহাইর ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর । সাহাবা কিরাম তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর কাছে বসে বললেনঃ ----------

---------- হে আল্লাহর রাসুল! ঈমান কী? রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি, উত্থানের বিষয়ে এবং পুরোপুরি তাকদীরে ঈমান রাখবে। আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। ---
---

তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেনঃ তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ) তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সমন্ধে জ্ঞান লাভ কর। (হাদিছের অংশ বিশেষ)

---

iii) ঈমান এর শর্ত ৩টি

==========

a) মুখে স্বীকার

b) অন্তরে বিশ্বাস

c) তা অনুযায়ী আমল

ইহসান

=====

৩। ইহসানঃ এটি হচ্ছে ইসলামের তিন স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর।

সহিহ মুসলিম: বই ১: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: হাদিস ৪, হাদিস ৬

যুহাইর ইবন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর । সাহাবা কিরাম তার কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পেলেন। (রাবী বলেন) তারপর একজন লোক এলেন এবং তাঁর কাছে বসে বললেনঃ----------
---------- হে আল্লাহর রাসুল! ইহসান কী?

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তাঁকে দেখছ, যদি তাকে নাও দেখ; তাহলে ধারণা করবে যে তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। -------

তারপর আগন্তুক উঠে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেনঃ তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ) তোমরা প্রশ্ন না করায়, তিনি চাইলেন যেন তোমরা দীন সমন্ধে জ্ঞান লাভ কর। (হাদিছের অংশ বিশেষ)

ঈমান/ইসলামচ্যুত বা ভঙ্গ বা কাফির হওয়ার অন্যতম ১০টি কারণঃ

স্কলাররা ধর্মত্যাগের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয় এমন কোন কাজ করলে যা ইসলামবিরোধী। ইসলামকে অকার্যকর করে দেয় এমন কোন কাজ একজন ব্যাক্তিকে ইসলামের সীমা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। (ইসলামের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এবং তাকে পুন:পুন: স্পষ্টভাবে বুঝানো সত্যেও) একজন ব্যক্তি যদি ইসলামচ্যুত তথা মূর্তাদ হয়ে যায় তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে তার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড এবং তার সম্পদ সিজ করে নেয়া । এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন বিষয় হল দশটি যা মুহামাদ্দ বিন সুলেয়মান আত-তামীমীর লেখা বই নাওয়াক্বিদুল ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে ও অন্যান্য স্কলার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয় গুলো পেশ করা হল এই আশায় যে আপনারা ইসলামচ্যুতির ভয় থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন।

শাইখ আব্দুল আজীজ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে বা'য (রহ) বলেন: আল্লাহ সকল মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করে এর সাথে লেগে থাকতে বলেছেন এবং ইসলামের বিপরীত যে কোন কিছু থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি তার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন মানুষকে ইসলামের পথে ডাকার জন্য। তিনি বলেন যে যারা নবীর অণুসরন করবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং যারা তার থেকে দূরে সরে যাবে তারা বিপথগামী হবে। কোরআনের বহু

আয়াতে তিনি ধর্মত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন সকল প্রকার শির্ক ও কুফরি থেকে।

১- শিরক তথা আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদাতে অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। "নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়"। (আন-নিসা' ৪:১১৬)

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই"। (মা'য়িদাহ ৫: ৭২)

এর মধ্যে আছে মৃতদের কাছে, জ্বীনদের কাছে বা কবরে প্রার্থনা করা, তাদের সাহায্য খোজা, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মানত করা ও কোরবানী করা।

২- যারা আল্লাহ ও তার মধ্যে যোগাযোগের মধ্যস্থতাকারী (intermediary) রুপে কাউকে বা কোন জিনিসকে বেছে নেয়, তাদেরকে যোগাযোগের মাধ্যম হতে বলে এবং তাদের উপরেই তার আস্থা স্থাপন করে (অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর কাছে চায় না এবং নিজের ঐকান্তিকতার উপর আস্থা স্হাপন করে না) তাদের ব্যাপারে আলেমদের ঐক্যমত হল এই যে, এরা কাফের।

৩- যারা অংশীদারস্থাপনকারীদের (মুশরিকুন) অস্বীকারকারী (কাফির) মনে করে না, অথবা তাদের কুফরী সম্মন্ধে সন্দেহ পোষন করে অথবা তাদের পদ্ধতিকেও সঠিক মনে করে তারা কাফির।

৪- যারা মনে করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশিক্ষন ছাড়া অন্য কিছু বেশী পূর্নাঙ্গ, অথবা তাঁর নিয়মকানুনের চেয়ে অন্য কোন নিয়মকানুন উত্তম - তারা কাফির।

৫- যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের কোন একটি অংশকে ঘৃণা করে, যদিও বা বাধ্য হয়ে সে তা পালন করছে, সে কাফির। কেননা আল্লাহ বলেন:

"এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন" (মুহাম্মাদ ৪৭: ৯)

৬- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রচারিত ধর্মের যে কোন বিষয় নিয়ে কেউ যদি মজা করে, অথবা পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত যে কোন বক্তব্য নিয়ে টিটকারী দেয় বা দুষ্টুমি করে, সে কাফির।

এর প্রমাণ হল নিচের আয়াতটি:

"আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার" (আত তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

৭- যাদুবিদ্যা – একজন ব্যক্তিকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়ার জন্য বা একজন ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য যাদু করা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি এগুলো করবে বা এগুলোর সমর্থন করবে সে কাফির। কেননা:
"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না"। (বাকারাহ ২: ১০২)

৮- মুশরিকদের সমর্থন দেয়া এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করা।
এর প্রমাণ হল এ আয়াতটি যেখানে আল্লাহ বলেন: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না" (মা'য়িদাহ ৫:৫১)

৯- যারা বিশ্বাস করে যে কিছু ব্যক্তিদের মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আইনের বাইরে কাজ করার অনুমতি আছে যেমন অনুমতি ছিল মুসা (আ) এর আইনের বাইরে খিযির (আ) এর কাজ করার, তারা কাফির। কেননা

আল্লাহ বলেন: “যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত” । (ইমরান ৩: ৮৫)

১০- আল্লাহর মনোনীত ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া বা মুখ ফিরিয়ে নেয়া, এটাকে না শেখা এবং এর অনুসারে জীবন যাপন না করা। এর প্রমান হল: “যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব” (সেজদাহ ৩২:২২)

এ সকল কর্মকান্ড একজন ব্যক্তির জীবনে ইসলামকে অকার্যকর করে দেয় তা সে কৌতুক করেই থাকুক বা নিষ্ঠাবান হয়েই করুক বা হোক সে ধর্মভীরু। যদি তাকে বাধ্য না করা হয়ে থাকে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। উপরের প্রত্যেকটি অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক এবং এ ধরণের ঘটনা অনেক হয়ে থাকে। মুসলিমদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং এই অপরাধগুলোর মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ভীত থাকা উচিৎ। আল্লাহর কাছে আমরা এ বিষয়গুলো থেকে নিরাপদে থাকার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি এবং সাহায্য প্রার্থনা করি তার ক্রোধ ও কঠিন শাস্তি থেকে। মুহাম্মদ (সা) ও তার পরিবারের উপর এবং তার সহযোগীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তথ্যসূত্র: http://www.islam-qa.com/en/ref/৩১৮০৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৯৮

“কলমের জবাব” কিভাবে কলম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে?

শুহাদার কানন

Junior Member

১১-২৩-২০১৫

অনেকেই দাবি করেন, “কলমের জবাব” কিভাবে কলম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, এটা তাঁরা বোঝেন না। এরকম একটা ব্যাপার কিভাবে নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত হতে পারে - সেটা তাদের কাছে বোধগম্য না। যদি আসলেই বুঝতে চান, ব্যাপারটা বোঝা খুব কঠিন কিছু না। দুটো ভাবে আপনি ব্যাপারটা দেখতে পারেন। যেমন, কিছু ইসলামপন্থী কেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলমের জবাব চাপাতির মাধ্যমে দেয়াটাকেই অধিক যৌক্তিক মনে করেন সেটা বোঝার জন্য আপনি আধুনিক রাষ্ট্রের দিকে তাকাতে পারেন।

আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণায় “রাষ্ট্রদ্রোহিতা” বা “Treason” -কে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একারনে High Treason অধিকাংশ দেশেই, রাষ্ট্র অনুমোদিত সর্বোচ্চ শাস্তি দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেসব দেশে মৃত্যুদন্ডের বিধান আছে, যেমন বাংলাদেশ; সেসব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা কিন্তু বিভিন্নভাবে হতে পারে। কথার মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে ইত্যাদি। সংঘটিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ কতোটা গুরুতর সেটা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে, নিজের আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী। এক্ষেত্রে সে অন্য কারো কাছ থেকে নৈতিকতা বা মানবতার সবক নিয়ে আসে না। সহজ ভাষায়, অপরাধ কতোটা গুরুতর তা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রয়োগের সম্পূর্ণ অধিকার রাষ্ট্রের আছে, এবং এ ব্যাপারে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্রের এই অধিকার সর্বজনস্বীকৃত।

এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, কথা বা কলমের জবাব ক্ষেত্র বিশেষে জেল,জরিমানা,নির্যাতন, ফাঁসির দড়ি কিম্বা ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে হতে পারে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারিত হয়। এখানে খেয়াল করার বিষয় হল, শাস্তি কি হবে, সেটা কোন তৃতীয় পক্ষ ঠিক করে না। যার উপর অপরাধ করা হয়েছে (i.e. রাষ্ট্র) সে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা ঠিক করে।রা কেউ

এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। কারণ এখানে ব্যাপারটা নিছক, কথা বা বিচ্ছিন্ন একটি কাজের সাথে সম্পর্কিত না। এটা সমগ্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের সাথে জড়িত একটি বিষয়।

একইভাবে ইসলামের একটী আলাদা সংবিধান আছে – কুর'আন। ইসলামের সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান আছে। ইসলামে ইসলামদ্রোহ এবং ইসলামদ্রোহিতার সাথে কিভাবে ডিল করতে হবে সে বিষয়ে নিয়মাবলী আছে। ইসলাম এই ব্যাপারে মানুষের তৈরি মানবিকতা, বা নৈতিকতার সংজ্ঞা অনুসরণ করতে বাধ্য না। ষ্ট্রদ্রোহিদের বিচার করার সময় বাংলাদেশ যেমন পাকিস্তানের কথায় কান দিতে বাধ্য না, একইরকম ভাবে সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট, বা লিবারেল ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি ইসলামদ্রোহিতার শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কি ভাবলো সেটা নিয়ে মুসলিমরা মাথা ঘামাতে বাধ্য না। একারণে ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামদ্রোহিতার অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডকে নির্ধারণ করেছে। এই শাস্তি তলোয়ার, চাপাতি, বন্দুক, রকেট লঞ্চার বা অন্য যে কোন কিছুর মাধ্যমে কার্যকর করা যেতে পারে।আপনি যদি আধুনিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহিতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করেন, সম্মান করেন এবং বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে থাকেন, তাহলে ইসলামের এই অধিকার নিয়ে আপনি কিভাবে প্রশ্ন তোলেন?দুটো ক্ষেত্রেই মূলনীতি এক। একটার যৌক্তিকতা মেনে নিলে, আপনাকে অপরটা অবশ্যই মানতে হবে, অন্যথায় আপনার অবস্থান নিছক হিপোক্রেসি এবং ডাবল-স্ট্যান্ডার্ডের ম্যানিফেস্টেইশান ছাড়া আর কিছুই না।

একইসাথে এটাও লক্ষণীয় যে মুসলিমদের যে অংশটা "কর্মের স্বাধীনতার" কথা বলছে, তাঁরা কিন্তু এই মনোপলিস্টিক সিস্টেমের ঠিক করা নিয়মকানুন অনুসারে তাঁদের চিন্তা ও কাজ পরিচালনা করবেন না। ভায়োলেন্সের মনোপলির মাধ্যমে এই সিস্টেম মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অস্ত্রের মাধ্যমে, কলমের মাধ্যমে না। অস্ত্রের মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে কতৃত্ব অর্জনের পরই পশ্চিমা কলোনিয়ালিস্টরা "সভ্যতা" আর "মানবতা" চিনেছে। এই মুসলিমদের কাছে তাই অস্ত্রের জোড়ে চাপিয়ে দেয়া এই দাসত্বের ফলাফল হল কলমের মাধ্যমে করা এই অবমাননা। তাই মূল সমস্যার উৎস কলম না। মূল উৎস শক্তির জায়গায়। অস্ত্রের শক্তি এবং ভায়োলেন্সের মনোপলির কারণেই কলমের মাধ্যমে বিনা জবাবদিহিতার এই অবমাননার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই এই মনোপলি ভাঙ্গতে হলে আপনাকে

পশ্চিমাদের তৈরি করা বক্সের বাইরে চিন্তা করতে হবে। তাদের নির্ধারিত আইনের বাইরে আপনাকে যেতে হবে। আপনাকে ভায়োলেন্সের মনোপলি ভাঙ্গতে হবে, এবং সেটা কলমের মাধ্যমে হবে না।

আপনি শক্তির মাধ্যমে কিছু লোকের উপর আপনার কতৃত্ব চাপিয়ে দিলেন, তারপর বললেন এই লোকগুলো যদি কতৃত্ব ফিরে পাবার জন্য শক্তি ব্যবহার করে তাহলে সেটা বেআইনি – এটা তো হয় না। এই লোকগুলো সেটা মেনে নেবে না। কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি কিম্বা জাতি এটা মেনে নেবে না। মেনে নেবে শুধুমাত্র নির্বোধ, আত্মমর্যাদাহীন এবং প্রকৃতিগতভাবে দাস প্রজাতির কিছু মানুষ। মুসলিমরা নির্বোধ না এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁরা আত্মমর্যাদাহীন না।

লিখেছেন একজন ভাই, আল্লাহ উনাকে উত্তম প্রতিদান দিন আমিন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/newreply.php?p=২৪৫৯৭

প্রিয়নবীর অপমানে..

Umar Faruq

Senior Member

০৯-০৩-২০১৫

প্রিয়নবীর অপমানে..

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যখন বিদ্রুপ ও তামাশা শুরু হয় তখন তা স্বাভাবিকভাবেই একজন মুসলিমের ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রেক করে। কিন্তু একই সাথে এ বিষয়টি একটি শুভ লক্ষণ নিয়ে আসে, আর তা হচ্ছে কুফফারদের আসন্ন পরাজয় এর বার্তা।

আল্লাহতালা বলেন,

"বিদ্রুপকারীদের জন্যে আমিই আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।" (সুরা আল হিজর ১৫, ৯৫)

"যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।" (সুরা আল কাউসার ১০৮,৩)

এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া বলেছিলেন অনেকটা এভাবে (আল শারিম আল মাসলুল ১১৬-১১৭ অনুকরণে ইমাম আনওয়ার আল আওলাকী তার দ্যা ডাস্ট উইল নেভার সেটল ডাউন বইতে উল্লেখ করেছেন),

"অনেক নির্ভরযোগ্য মুসলিমগন (যারা অভিজ্ঞ এবং ফকীহ) বেশীরভাগ সময়ই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যখন তারা শামের শহর, দূর্গ এবং খ্রিষ্টানদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তারা বলেছেন যে আমরা শহর অথবা দূর্গকে মাসাধিককাল ধরে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম, আমাদের অবরোধে তাদের কিছুই করার ছিল না, এবং আমরা প্রায়ই তাদেরকে ত্যাগ করে ছেড়ে চলে যাওয়ার অবস্থায় ছিলাম! এরপর যখনি তারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অভিশাপ দিতে লাগল, হঠাৎ করে এর পতন আমাদের হাতে আসতে লাগল, কখনও কখনও এর পতন হতে একদিন বা দুইদিন লাগছিল এবং এটা শক্তির দ্বারা খুলে গেলো। সুতরাং আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে গ্রহণ

করলাম যখন আমরা শুনলাম যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অভিশাপ দেয়া হয়েছে এমনকি যদিও তাদের প্রতি আমাদের অন্তর ছিল ঘৃণায় পরিপূর্ণ কিন্তু আমরা এটাকে একটা শুভ সংবাদ হিসেবে দেখলাম কারণ এটা ছিল আমাদের আসন্ন বিজয়ের একটি লক্ষণ।

এছাড়াও এই জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত আরও বেশ কিছু বিষয় হচ্ছে (ইসলামকিউএ ডট কম সাইট থেকে অনুদিত। মুল এখানে (ইংরেজি)),

১.

এই ঘৃন্য অপরাধীদের অন্তরে যা লুকায়িত ছিল যেমন মুসলিমদের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ, সেটা বেরিয়ে আসে। যদিও বেশিরভাগ সময় তারা শান্তিপ্রিয় বলে নিজেদেরকে দাবী করে।

"শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।" (আলে ইমরান ৩, ১১৮)

২.

পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতি ফুটে ওঠে। এখানে তারা বাক-স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে, কিন্তু যেকোন বিজ্ঞ লোকই জানে যে তাদের এই কথিত বাক-স্বাধীনতার সমাপ্তি প্রয়োজন কেননা সেটা হয় অন্যের অধিকারকে ক্ষর্ব করে এবং সীমালংঘনের মাধ্যমে। তারা বাকস্বাধীনতার নামে তাদের মিথ্যাচারগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করে। আমরা কয়েকবছর আগেই দেখেছি যখন একটি রাষ্ট্র তাদের সব মুর্তি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল তখন। তখন সেই তথাকথিত স্বাধীনতা কোথায় ছিল? তারা এটাকেও কেন সেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হিসেবে গন্য করে না?

৩.

কিছু কিছু পাশ্চাত্যবাদীর মোড়ক উন্মোচন যারা বলে থাকে, "তাদেরকে কাফির বলো না, বরং বলো অন্যরা, যেন তাদের ও আমাদের মাঝে কোন্দলের উষ্কানি সৃষ্টি না হয়।"

কিন্তু প্রত্যেকের এটা বোঝা উচিত যে কে সত্যিকার অর্থে অপরকে ঘৃণা করে, অন্যের মতকে অসম্মান করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই যুদ্ধ বাধায়।

৪.

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সীমা অতিক্রম না করার ওপর ভিত্তি করে সভ্যতার সংলাপের যে আষাঢ়ে গল্প সারা বিশ্বব্যাপী তারা ছড়িয়েছে সেটার অসারতা প্রমাণিত হয়। তারা কি ধরনের সংলাপ আশা করে? তারা কেমন সম্মান আমাদের সামনে তুলে ধরতে চায়? তারা আমাদের কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যাশা করে এবং এমনকি তাদের সামনে মাথা নত করি কিংবা সিজদারত হয়ে পড়ি সেটাও চায়, কিন্তু বিনিময়ে তারা আমাদেরকে নিয়ে মজা করবে এবং আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করবে আর আরো বেশি অত্যাচার করবে?

৫.

মুসলিমদের অন্তরে ঈমান চাঙ্গা হয়। এমনকি যে সব মুসলিম ঠিকমত তাদের ধর্মীয় দায়িত্বগুলো পালন করে না তাদের মধ্য থেকেও বদ্ধমূল ঈমানের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি আমরা এধরনের ঘটনার প্রতিবাদে।

৬.

মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা। আমরা দেখেছি, আলহামদুলিল্লাহ, ভাষা ও রাষ্ট্রগত ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা অভিন্ন একটি পন্থার ওপর অটল থাকে এই বিষয়ে।

৭.

এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পশ্চিমারা ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। যখনই কোন কাফির রাষ্ট্র অন্যান্যদের সহযোগিতা কামনা করে তখনই অন্য সবগুলো রাষ্ট্র একে অপরকে সহায়তা করে সেসব ব্যঙ্গচিত্র বিভিন্ন ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে যাতে মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ আছে। আমরা চাইলেও তাদের সবাইকে তিরষ্কার করতে পারবো না।

৮.

কিছু কিছু মুসলিম তাদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের সামনে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আমরা দেখেছে মুসলিমরা দ্রুততার সাথে তাদের ভাষায় বইপত্র প্রকাশ ও তাদের মাঝে বিতরণের কাজে নিয়োজিত হয় যাতে তাদের সামনে থেকে বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচিত হয় এবং তারা ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পায়।

৯.

যারা আমাদের বিরুদ্ধে ও আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের পণ্য বর্জনের উপকারিতা ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকবার দেখেছি। তাদের জাতিগুলো কোন রাজনৈতিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক চাপ দেবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে [বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে], এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু এই পণ্য বর্জন বেশিদিন স্থায়ী হয় না যখনই ঐসব প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক কিংবা মালিক দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয় [এটি নিঃসন্দেহে প্রতারণামুলক, কেননা শুরুতে তারাই এই ধরনের অন্যায়ের ইন্ধন যোগায়]।

১০.

পশ্চিমাদের কাছে একটা পরিষ্কার বার্তা পৌছে যায়। যে মুসলিমরা কখনই দ্বীনের প্রতি ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি এ ধরনের অপমান সহ্য করবে না। আমরা প্রয়োজনে আমার জীবন দিয়ে দেব।

কেউ রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান করলে তাদের জবাব দেয়া কি জরুরী?

(ইসলামকিউএ ডট কম সাইট থেকে অনুদিত। মুল এখানে (ইংরেজি))

প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদ্রুপ করে খ্রিস্টানরা যা কিছু করছে সেগুলো সম্পর্কে জানে না আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। এবং এগুলো আমাদের অজানা নয় হয়ত আমাদের মধ্যে ইসলাম ও রাসুলের জন্য থাকা "গিরাহ" [রক্ষণাত্মক ঈর্ষাবোধ] এর কারনে। যারা রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান করে তাদের জবাব দেয়া যাবে কি? উল্লেখ্য যে আমি এমন কয়েকজনকে অপমান করেছি এবং আমার আত্নীয়রা অনেকে আমাকে উপদেশ দিয়েছে যাতে আমি ভবিষ্যতে আর এমনটি না করি। কারন সেক্ষেত্রে তারা আরও বেশি করে রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান করবে এবং বিদ্রুপ করবে। এতে করে আমি কি তাদের পাপের ভাগি হবো?

উত্তরঃ

আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপমান করা এক ধরনের কুফর

যা কোন মুসলিম করে থাকলে সেটা তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের (শাসকদের) উচিত যে এই কাজটি করেছে তাকে হত্যার মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বিষয়টিকে প্রতিরোধ করা। যদি অপমানকারী জনসম্মুখে এবং সত্যিকার অর্থেই কেউ তওবাহ করে এ কাজের জন্য তবে আল্লাহতা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু সেটা তার শাস্তিকে মোটেই কমাবে না, আর এই শাস্তিটি হচ্ছে হত্যা করা।

যদি অপমানকারী মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিম হয়ে থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তার সেই চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে কিন্তু এই দ্বায়িত্বটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া উচিত। যদি কোন মুসলিম কোন খ্রিস্টান বা অন্য কাউকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপমান করতে দেখে তবে তাকে কঠোর ভাষায় তাকে তিরষ্কার করতে হবে। সে লোককে তিরষ্কার করা অনুমোদিত কারন সেই প্রথম এটা শুরু করেছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মানে আমরা চুপ করে বসে থাকবো? যথাযথ কর্তৃপক্ষ যে তাকে শাস্তি দিতে পারবে তাকে বিষয়টি জানানো ওয়াজিব। যদি এমন কেউ না থাকে যে আল্লাহ ও তার রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারিত "হাদ শাস্তি" [এক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড] দিতে পারবে, তবে একজন মুসলিমকে সে যতটুকু পারে ততটুকুই করে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্য কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু যদি একজন মুসলিম কোন কাফিরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যঙ্গ করতে শোনে এবং চুপ থাকে এই ভয়ে যে ঐ লোক হয়ত আরও বেশি করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে তবে তার এই চিন্তাভাবনা ভুল। এই আয়াতটি,

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করে তাদেরকে মন্দ বলো না, সেক্ষেত্রে তারাও আল্লাহকে ভুলবশত অজ্ঞতার কারনে গালি দেবে।" (সুরা আল আনাম ৬,১০৮)

এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে তারাই আল্লাহ ও তার রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে বিদ্রুপ করা শুরু করেছে। বরং এখানে বোঝানো হয়েছে যে মুশরিকদের দেবতাদেরকে প্রথমে মন্দ বলা হারাম কারন তারাও না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে সেক্ষেত্রে বাজে মন্তব্য করবে। কিন্তু যদি তারাই প্রথমে

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বিদ্রুপ করা শুরু করে, তখন আমাদেরকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে এবং তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে এমনভাবে যেন তা তাদের শত্রুতা ও কুফর থেকে বিরত করে। যদি আমরা কাফির ও নাস্তিকদেরকে তিরষ্কার ও শাস্তি না দিয়ে তাদের ইচ্ছেমত বলে যেতে দেই যেটা তারা ভালবাসে তবে অনেক বর ফিতনা সৃষ্টি হবে।

তাদের কথায় মোটেই পাত্তা দেয়া যাবে না যারা বলে যে তাদেরকে অপমান করলে এবং তাদের কথার প্রতিবাদ করলে তাদের একগুয়েমী আরও বাড়বে। একজন মুসলিমের অবশ্যই প্রতিরোধমূলক ঈর্ষাবোধ থাকতে হবে এবং আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এ বিষয়ে তাকে উত্তেজিত হতে হবে। যে কেউ রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান হতে দেখবে এবং কোন ধরনের ক্রোধ বা হিংসা অনুভব করবে না সে মুমিন হতে পারে না। -আমরা আল্লাহতা'আলার কাছে অপমান, কুফর ও শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষা চাই।

এবং আল্লাহ তালাই ভাল জানেন।

শেইখ আবদ আর-রহমান আল-বাররাক, মাজাল্লাত আদ-দাওয়াহ, মহররম, ইস্যু নং ১৯৩৩

***

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিদ্রুপকারীকে হত্যার জন্য কারও অনুমতি দরকার হয় কিনা?

ইসলামকিউএ ডট কম সাইট থেকে অনুদিত। মুল এখানে (ইংরেজি)

প্রশ্নঃ [আবু দাউদ (৪৩৬১), সুনানে নাসাঈ (৪০৮১) থেকে উম্মু ওয়ালাদ নামের এক দাসীর হত্যার ঘটনা* উল্লেখপূর্বক] ... আমি মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) এর শাস্তির (মৃত্যুদন্ড) কথা জানি এবং এও জানি যে এটা কেবল শাসক বা শাসকের নিযুক্ত কেউ কার্যকর করতে পারে। ... আমি ইসলাম সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেক করবার জন্য নয় বরং কেবল উত্তরটি জানতে চাই যেন যারা ইসলামকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের জবাব দিতে পারি।

উত্তরঃ

“হাদ শাস্তি” (এক্ষেত্রে যেটা মৃত্যুদন্ড) কেবল শাসক বা শাসকের নিযুক্ত কেউ কার্যকর করতে পারে এই ধারনার বিষয়ে, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এই বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন,

“এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দ্বীনত্যাগকারীর হুদুদ শাস্তি কেবল শাসক কিংবা তার নিযুক্ত কেউ কার্যকর করতে পারে।“

তারপর তিনি বলেন,

১. মুনীব তার দাসের হুদুদ শাস্তি কার্যকর করতে পারেন এই দলীলের ভিত্তিতে যে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসেদের হুদুদ শাস্তি কার্যকর কর।” (আহমদ(৭৩৬) এবং অন্যান্যদের দ্বারা বর্ণিত, দলীল দ্বারা হাসান বলে সাব্যস্ত বলেছেন আল-আরনাউত; যদিও আলবানীর অভিমত যে এটি আলী (রাঃ) এর বক্তব্য, আল ইরওয়া (২৩২৫) দ্রষ্টব্য।) এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যদি তোমাদের দাসী কেউ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে সেজন্য তার শাস্তি কার্যকর কর।” (আবু দাউদ (৪৪৭০),সহীহা গ্রন্থেও এমন একটি বর্ণনা রয়েছে) আমি হাদিস শাস্ত্রের “ফুকাহাহ”দের (যিনি ফিকহ জানেন) মাঝে এমন কারও কথা জানি না যিনি এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন যে সে (মনিব) তার (দাসীর) ওপর শাস্তি কার্যকর করতে পারে। ... ... [এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দলীলাদি দেবার পর] সুতরাং এই হাদিসটি তাদের জন্য দলীল যারা বলেন যে মনিব দাসের হুদুদ শাস্তি দিতে পারেন তার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে, সব ক্ষেত্রে।

২. বড়জোর যেটা বলা চলে এ ব্যাপারে তা হলো সে শাসকের অধিকার খর্ব করেছে এবং শাসক চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন যে হুদুদ শাস্তি কার্যকর করেছে শাসককে বিষয়টি অবহিত করা ছাড়া।

৩. যদিও এটা একটা হুদুদ শাস্তি, এটা একজন “হারবি” (একজন মুসলিমের সাথে যুদ্ধে রত অমুসলিম)কে হত্যার আওতায়ও পড়ে এবং একটা “হারবি”কে মারা যে কারও জন্য অনুমোদিত।

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ও অনুরুপ ঘটনা ঘটেছিল যেমন আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীমাংসা মেনে নিতে অস্বীকার করায় উমার (রাঃ) এর হাতে এক মুনাফিক খুন হয়েছিল রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুমতি ছাড়াই। এবং এর পরে উমার (রাঃ) এর কাজটিকে অনুমোদন করে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছিল। এছাড়াও মারওয়ানের কন্যাকে [আসমা বিনতে মারওয়ান] এক ব্যক্তি হত্যা করে এবং রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আল্লাহ ও রাসুলের সাহায্যকারী হিসেবে অভিহিত করেন। [দ্রষ্টব্যঃ আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যার হাদিসটি দুর্বল, যদিও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এখানে এটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন আবু দাউদ (৪৩৬১), সুনানে নাসাঈ (৪০৮১) এ বর্ণিত হাদিসের আলোকে শাসকের অনুমতি ছাড়াই হত্যার বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য।] এর কারন হচ্ছে যে লোকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা অনিবার্য হয়ে পড়ে দ্বীনকে ধ্বংস করবার অপচেষ্টার জন্য, সেটা যাকে জিনা কিংবা এরকম বিষয়গুলোর কারনে হত্যা করা হয় তার মতন না।

আল-সারিম আল মাসলুল (২৮৫-২৮৬) থেকে উদ্ধৃত।

০০০

*উম্মু ওয়ালাদ নামের এক দাসীর হত্যার ঘটনাঃ (আবু দাউদ (৪৩৬১), সুনানে নাসাঈ (৪০৮১) হাদিস দুটি দ্রষ্টব্য। নাসিরুদ্দিন আলবানী উভয় হাদিসকে হাসান বলেছেন)

একজন অন্ধ ব্যক্তি যার অধীনে একজন দাসী ছিল, যার নাম ছিলো উম্মু ওয়ালাদ। উম্মু ওয়ালাদ হচ্ছে একজন আবদ্ধ নারী, যে তার মনীবের বাচ্চা বহন করেন। তাই তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হত এবং তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি প্রযোজ্য হয়। এই ব্যক্তি তার উম্মু ওয়ালাদ থেকে দুজন সন্তান বহন করেন। কিন্তু এই মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অভিশাপ দিতেন। এবং তাকে তিনি তা না করার জন্য সাবধান করার পরেও সে বিরত হতো না! এক রাতে সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো। তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরে চাপ দিতে থাকলেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়!

সকালে আল্লাহর রসূলের নিকট খবর পৌঁছল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে একত্র করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি যে কাজটি করেছো উঠে দাড়াও। অন্ধ ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বসে পড়ে বললেন,"হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই ব্যক্তি যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে বিরত থাকার কথা বলার পরও সে বিরত হতো না! তার হতে আমার মুক্তার মতো সন্তান আছে এবং সে আমার প্রতি খুব সদয় ছিলো। কিন্তু গত রাতে সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম!"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জেনে রেখো যে তার রক্তের কোন মূল্য নেই।" অর্থাৎ, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও কোন শাস্তি নেই!

***

আমরা এ বিষয়ে আরও যা যা করতে পারিঃ

(ইসলামকিউএ ডট কম সাইট থেকে অনুদিত। মুল এখানে (ইংরেজি))

১.

আমাদেরকে অবশ্যই বল প্রয়োগের মাধ্যমে এটাকে প্রতিরোধ করতে হবে, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, হতে পারে এমনকি পত্র বা লেখা পাঠিয়ে কিংবা ফোনকল করে তাদের সরকার ও পররাষ্ট্র দপ্তরে এবং সংবাদপত্রগুলোতে।

৩.

আমরা তাদেরকে কাছে পরিষ্কার এবং সত্যিকার অর্থে ক্ষমা দাবী করবো। প্রতারণা কিংবা যেই অন্যায়ের সাফাই গাওয়া যেটাকে তারা ক্ষমা বলে আখ্যায়িত করে সেটা না। আমরা মুসলিমদের জন্য অসম্মানজনক কোন ক্ষমা দেখতে চাই না। বরং আমরা চাই তারা তাদের ভুল স্বীকার করুক এবং এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাক।

৪.

আমাদের সেই অন্যায়ের [দৃষ্টান্তমূলক] শাস্তি দাবী করা উচিত।

৫.

আমাদের উচিত তাদের ভাষায় বই পুস্তক অনুবাদ করে তাদের হাতে তুলে দেয়া যাতে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ওনার জীবনী সম্পর্কে জানতে পারে।

৬.

আমাদের উচিত হবে রেডিও এবং টেলিভিশনে সময় ক্রয় করে রাসুলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মান রক্ষার্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা। যেগুলো সামর্থবান এবং ভাল জ্ঞানী লোকজনের দ্বারা উপস্থাপিত হওয়া উচিত যারা জানে কিভাবে পশ্চিমাদেরকে বুঝাতে হয়। আলহামদুলিল্লাহ এমন অনেকে আছেনও।

৭.

আমাদেরকে পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং ওয়েবসাইটগুলোতে বিভিন্ন ভাষায় ক্ষুরধার লেখা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

৮.

তাদের পন্য বর্জন সম্পর্কে, যদি সেটা কার্যকরী হয়- যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে-তাহলে আমরা কেন তাদেরকে বর্জন করছি না এবং যদি সম্ভব হয় তবে মুসলিমদের মালিকানাধীন বিকল্প পণ্য খুঁজছি না?

৯.

ইসলামের সৌন্দর্য এবং সুন্দর যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং সন্দেহদূরকারী বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলামের এবং রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে এই ধ্বংসাত্নক আক্রমনকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

১০.

আমরা সব বিষয়ে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহের অনুসরণ এবং মেনে চলতে গিয়ে যাতে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারি।

“তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না।“ (সুরা আলে ইমরান ৩, ১২০)

১১.

তীব্র ঘৃণা ও অপছন্দের চশমা দিয়ে তাদেরকে দেখা সত্ত্বেও কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে এবং পরকালীন মুক্তির দিকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তাদের প্রতি যেখানে সম্ভব দয়া এবং ক্ষমা দেখিয়ে।

আমরা আল্লাহতা'আলার সাহায্য কামনা করছি যেন তিনি তার দ্বীনকে বিজয়ী করেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে বিজয়ী করেন এবং কুফফারদেরকে অপমানিত করেন।

"আল্লাহ নিজ কাজে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং পারঙ্গম, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সুরা ইউসুফ ১২, ২১)

আল্লাহতা'আলা তার রাসুলের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষন করুন।

আরও পড়ুনঃ

The Dust will never settle down

বাংলা অনুবাদ বইঃ এ যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

লেখকঃ শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রাহিমাহুল্লাহ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬০৮

আল কায়েদা কি আসলেই শরীয়াহ কায়েমে অক্ষম?

Alif

Member

০৮-১৯-২০১৫

আল কায়েদা কি আসলেই শরীয়াহ কায়েমে অক্ষম?

আস সালামু ‘আলাইকুম,

আমাদের অনেক জিহাদ প্রেমী ভাইয়ের মনের কোনে হয়ত এমন ধারনা আছে, বা সন্দেহ পোষন করেন যে, আল কায়েদাহ কি পারবে আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েম, শরীয়াহ কায়েম করতে? যেহেতু তারা সালাফি ঘেষা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তারা এখন পর্যন্ত ইতিহাসে তেমন নজির দেখাতে পারেন নি... তবে এর মাঝে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, ঐসব ভাইদের অধিকাংশই শরীয়াহ কায়েম বলতে হুদুদ কায়েম বুঝে থাকেন তাই তাদেরই একটা দল যখন দেখলো দাউলাতুল খারেজী হুদুদ কায়েমের নামে শরীয়াহ কায়েম করছে তখন তারা তাদের এই বিষয় গুলো এইচ ডি ভিডিও তে দেখে সাত পাচ না ভেবে তাদেরকে সমর্থন, সাহায্য, বায়াহ দেয়া শুরু করলো... সুবহানাল্লাহ... এবং বক্রভাবে এই কথাও বলা শুরু করলো আল কায়েদা এবং তালেবানরা না কি রাষ্ট্র চালাতে সক্ষম নয়? এই ব্যাপারে আমার নিচের কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরলাম যা মোটেও ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়...

১। দূর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, খুলাফায়ে রাশেদা ছাড়া পরবর্তী সময়ে যত খলিফা এসেছেন অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের প্রায় সবাই বিভিন্ন ধরনের আক্বিদাহ গত ভ্রান্তি ধারন করতেন যা একদম শেষ দিকে মানে উসমানী খেলাফতের সময়ে এসে প্রকট আকার ধারন করে। এই কারনে অনেকে ভুল ক্রমে সেসব ভ্রান্ত আক্বিদাহ গুলোকে রাষ্ট্র বা, শরীয়াহ কায়েমের অধিক যোগ্য মনে করে ফেলছেন। হয়ত বিষয়টা এমনই। না হলে কেন খুলাফায়ে রাশেদার যুগ হবে মাত্র ৩০ বছর +/- আর বংশীয় শাসন গুলো থাকবে হাজার বছর।

২। আল কায়েদাকে এই রাষ্ট্র কায়েম করতে না পারার দোষে কিছু দিন আগে শায়েখ আবু বাসির তারতৌসী হাঃ দোষী সাব্যস্ত করেন। তখন শামের আল

কায়দার প্রধান সামরিক কমান্ডার, শায়েখ আবু ফিরাস আস সুরী হাঃ , যিনি শায়েখ উসামা বিন লাদেনের দীর্ঘ দিনের সহচর ছিলেন, বলেন – আমরা এখন বর্তমান সময়ের কুফরের প্রধান আমেরিকার সাথে লড়াই করছি এমন অবস্থায় তাদেরকে ধ্বংস না করে আমরা কোন ইমারত গঠন করতে পারবো না বা, চেষ্টা ও করছি না কারণ যদি তা করা হয় তবে তা সাধারন বুদ্ধি পরিপন্থি হবে। তাই যে বিষয় আমরা আমাদের ইজতিহাদের কারণে গড়ার চেষ্টা করিনি তা আমরা করতে পারিনি সেটা কিভাবে বলা যাবে?

৩। মালীতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন AQAP এর আমির শায়েখ নাসির আল উহাইশী রঃ একটা বার্তা দিয়েছিলেন AQIM এর আমির শায়েখ আবু মুস'আব আব্দুল ওয়াদুদ হাঃ কে এই ব্যাপারে সতর্ক করে যে, আপনি এখনি কোন ইমারত গঠন করতে যাবেন না যখন আমেরিকাকে আমরা এখন পরাভূত করতে যাই নি।

৪। একই ভাবে শায়েখুল মুজাহিদ ওসামা বিন লাদেন রঃ আদনে আবিয়ানে যখন ইমারত গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন তিনি ও তখন AQAP এর আমিরকে ইমারত ঘোষণা না করে উম্মতের প্রতি হামদার্দী দেখিয়ে যেন যতটুকু পারা যায় ততটুকু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে বলেন এবং উম্মতকে যতটুকু পারা ছাড় দেয়া যায় তা দিতে।

৫। বর্তমানে ইমারতে আফগানিস্তানেও যখন কোন এলাকা স্বাধীন হয় তখন সেই এলাকাও কোন ধরনের মিডিয়া মনোযোগ আকর্ষন না করেই শরীয়াহ কায়েম করে থাকেন। এর জন্যে আপনারা "Hallamark of jihadi experience in Imrate isamiyah" নামের শাহমাতে একটা প্রবধ পড়ে দেখতে পারেন।

৬। আবার সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কুফরের প্রধানকে অক্ষত রেখে মুরতাদ শাসককে অপসারন করা কত টুকু অযৌক্তিক ও অসম্ভব। এই পর্যালোচনা আমি করি নি, বরং এটা শায়েখ আবু মুস'আব আস সুরি ফাঃ এর পর্যবেক্ষন। তাহলে কি আমরা সেই আমেরিকাকে অক্ষত রেখে দ্বীন কায়েম করতে যাব? যদি তাই করি তবে ইতিহাস থেকে কি শিখলাম? মু'মিনকে একই গর্তে কত বার দঃশিত হবে হবে?

৭। এই ব্যাপারে শায়েখ হানি আস সিবাঈ হাঃ এর একটা লেকচার রয়েছে, যেখানে উনি বলেছেন, বর্তমান আমেরিকার যে এয়ার পাওয়ার আছে তাকে অক্ষত রেখে কোন মুসলিম ভুখন্ডে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

৮। আর আজকে পাওয়া একটা প্রবন্ধে পেলাম, AQAP এর একজন সিনিয়র শায়েখ, শায়েখ সাঈদ আস সিহরী রঃ বলেন, এই বিষয়টি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদেরকে বুঝতে হবে, তা হল, আমরা ততক্ষন পর্যন্ত শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষন হব না যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা মুসলিম ভুখন্ড গুলো থেকে আগ্রাসী শত্রুদেরকে বের করে দিতে সমর্থ হচ্ছি।

তাহলে আমরা উপরের বিষয়গুলো থেকে বুঝলাম যে, কুফরের প্রধান আমেরিকাকে অক্ষত রেখে ইসলামী ইমারত স্থাপনের চেষ্টা ঘোষনা করে করছেন না বরং বিষয়টা অঘোষিত অবস্থায় রয়েছে। তাহলে যা করার চেষ্টা করা হয় নি বা, করলেও আমাদেরকে জানিয়ে করা হয় নি, তার জন্যে কিভাবে আল কায়েদা / জিহাদী সালাফীরা শরীয়াহ কায়েম করতে পারেন নি সাব্যস্ত হবে? সুবহানাল্লাহ...
ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ

collected

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৯৯

যে সকল কাজ বা আমল একজন মুসলিমকে কাফেরে পরিনত করে

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-১৮-২০১৫

১ম পর্ব

মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। আবার মুসলমান হবার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দীন ও ঈমানকে প্রত্যাহার করে কাফির হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়। চাই সে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলুক, কুফরীর আনুগত্য বা অনুসরণ করুক বা নামায পড়ুক আর না পড়ুক। আমাদের একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে কেউ মুসলিম পরিবারের জন্ম গ্রহণের ফলেই ঈমান তার ওপর জেঁকে বসে। অতএব, ঈমান কার ওপর আনতে হবে, কিভাবে ঈমানকে রক্ষা করতে হবে – এগুলোর জানার কোনই প্রয়োজন নেই। অথচ সমস্ত কুফরকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী বিধান যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ঈমানের ওপর টিকে থাকা এবং নিজেকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন যে সকল কুফরীর কারণে মুসলমান কাফের হয় অর্থাৎ ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় এগুলো নিম্নে দশটি দফায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

1. একঃ আস-শিরকঃ আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) ইবাদতে শরীক করা, এ ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেনঃ

• ‘‘আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না; উহা ব্যতিত আর যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।’’ (সূরা আন-নিসা ৪, আয়াত ৪৮)

এবং মহাপরাক্রমশালী আরো বলেনঃ

''... বস্তুত আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও যে শরীক করেছে আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এ সব জালেমের কোনই সাহায্যকারী নেই।'' (সূরা আল-মায়িদাহ ৫, আয়াত ৭২)

কেউ আল্লাহর সাথে যে বিভিন্ন প্রকার শরীক করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে ইতিপূর্বে বর্ণিত অলিহাহ, আরবাব, আনদাদ ও তাগুত।

বর্তমান কালের কয়েকটি বড় বড় শিরক সমূহের মধ্যে রয়েছে মাজার ও কবর পুজা, পীর ও অলি আল্লাহ গায়েব জানেন। অসুস্থকে সুস্থ করতে পারেন। বাচ্চা দিতে পারেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন কিংবা আমাদের মনের খবর পীর বাবার জানা ইত্যাদি ধারণা পোষণ করা সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একমাত্র আইন ও বিধান দাতা। কুরআন আর সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা, শাস্তি, অর্থনীতি কিভাবে চালাতে হবে এবং এগুলির ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া বিধানই প্রত্যেক মুসলিমের একমাত্র সংবিধান। যদি কেউ আল্লাহর দেয়া সংবিধানের উপর নিজেরা আইন তৈরি করে তবে তারা তাগুত (আল্লাহদ্রোহী, সীমালংঘনকারী) এ পরিণত হবে। যারা তাগুতের তৈরি সংবিধানকে মানবে তারা আইন মানার বিষয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে মুশরিকে পরিণত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর দেয়া শরীয়া আইন বাদ দিয়ে যে সমস্ত বিচারক মানুষের তৈরী করা আইন দিয়ে বিচার ফায়সালা করে তারাও তাগুত। এবং যে সকল লোক তাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় বিচার-ফায়সালা নিয়ে যাবে তারাও শিরকের গুনাহতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বাদ পড়ে যাবে।

2 দুইঃ যে ব্যক্তি তার নিজের এবং আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মধ্যে মধ্যস্থতা ও যোগাযোগের মাধ্যম বানায় এবং তাদের কাছে তার মনোস্কামনা পূরণের (শাফায়া) জন্য আবেদন-নিবেদন করে এবং তাদের ওপর নির্ভর করে (তাওয়াক্কুল) সে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায়। এটাই অতীত ও বর্তমানকালের মুসলমানদের সর্বসম্মতি (ইজমা)।

''তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের না করতে পারে কোনো ক্ষতি, না করতে পারে কোনো উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ্কে

এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যে সম্পর্কে তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে অবহিত নন? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত জিনিস থেকে, যে গুলোকে তোমরা শরীক করছো।'' (সূরা ইউনুছ ১০ঃ আয়াত ১৮)

''জেনে রাখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি যেনো তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'' (সূরা আয্-যুমার ৩৯, আয়াত ৩) এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হবে যদি কোন ব্যক্তি একজন পীর (ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) বা দরবেশের কাছে যায় এবং তাদেরকে সন্তান দেয়ার জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানায়, এছাড়াও তাবীজ দিতে বলে আর বিশ্বাস স্থাপন করে পীরবাবার তাবীজে সে সুস্থ হবে অথবা মন কামনা পূর্ণ হবে এসকল কাজ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা রুবুবিয়াতের সাথে পীরবাবা বা বুজুর্গকে শরীক করা হয় এটা সুস্পষ্ট শিরক যা কিনা একজন মুসলমানকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

3 তিনঃ যে ব্যক্তি বহুইশ্বরবাদীকে (মুশরিক) প্রত্যাখ্যান অথবা তাদের ধারণায় সন্দেহ করে না সে কাফির হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন লোক বলে যে, সে নিশ্চিত নয় একজন খৃষ্টান কাফির কি না, তাহলে সে নিজেই একজন কাফির হয়ে যায় কারণ সে ঈসাকে (আঃ) খোদা হিসেবে গ্রহণকারী খৃষ্টানদের (মুশরিক, পৌত্তলিক) প্রত্যাখ্যান করেনি।

4 চারঃ যে ব্যক্তি মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিপূর্ণতা ও দিক নির্দেশনা বা ফায়সালায় অবিশ্বাস করে সে কাফির। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার ফায়সালা হচ্ছে সীরাতুল মুসতাকিমের উপর। আর যারা তাগুতের কাছে যাওয়া বেশী পছন্দ করে তারা সত্য সঠিক পথ হতে বহু দূরে।

''যে লোকের কাছে আল্লাহ্র হেদায়াত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবার পরও সে রাসূলের বিরোধীতা করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য কারুর পথের অনুসরণ করে, তাকে সেই দিকেই আমি ফিরিয়ে দেব যে দিক সে ফিরে যেতে চায়। আর আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, এ জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ আবাস। আল্লাহ্

তায়ালা তাঁর অংশীদারকারীকে যে ক্ষমা করবেন না তা নিশ্চিত কথা। তবে এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করে তারা চরমভাবে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।'' (সূরা নিসা ৪, আয়াত ১১৫-১১৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার রূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করা এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক। এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা। এ বিষয়ের ওপর এদিক দিয়ে আলোচনা হতে পারে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কি না? যদি আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হেকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া পথের বা অন্য কারুর অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ্ শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

২য় পর্ব

❺পাঁচঃ যে ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে অসন্তুষ্ট যদিও সে এ অনুযায়ী কাজ করে, সে অবিশ্বাসী (কাফির) হয়ে গেছে। এরকম এক উদাহরণ হতে পারে এমন এক ব্যক্তি যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে অথচ সে এগুলো করা অপছন্দ করে অথবা এমন এক মহিলা যে হিজাব পরে অথচ সে তা পরা অপছন্দ করে।

''আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।'' (সূরা আল বাক্বারাহ ২, আয়াত ৮)

''না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবেনা বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।'' (সূরা আন-নিসা ৪: আয়াত ৬৫)

6 ছয়ঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের (ধর্মের) আওতার কোনকিছুর ব্যাপারে উপহাস করে বা কৌতুক করে অথবা ইসলামের কোন পুরস্কার বা শাস্তির ব্যাপারে ব্যাঙ্গ করে সে কাফির হয়ে যায়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই কথাঃ ''বল, তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন-মাতানো কথাবার্তা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রসূলের ব্যাপারেই ছিল? এখন টাল-বাহানা করিও না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ ...'' (সূরা আত-তওবাহ ৯, আয়াত ৬৫-৬৬)

7 সাতঃ জাদু (আস-সিহর)। সকল প্রকার জাদু নিষিদ্ধ কেউ এতে অংশগ্রহণ করুক, সময় ব্যয় করুক বা চর্চার প্রতি সহানুভূতিশীল হোক না কেন। যে ব্যক্তি জাদু চর্চা করে বা জাদুতে খুশী হয়, সে কাফির হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

''... প্রকৃতপক্ষে সোলাইমান কখনই কুফরী অবলম্বন করে নাই। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তানগণ যারা লোকদেরকে যাদুগিরি শিক্ষাদান করতেছিল।'' (সূরা আল বাকারা ২, আয়াত ১০২)

8 আটঃ যে ব্যক্তি একজন মুশরিককে (বহু ইশ্বরবাদী, কাফের) সাহায্য ও সমর্থন করে এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করে সে কাফির কারণ তার কাছে আল্লাহর (সুবহানু ওয়া তায়ালা) প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন একজন মুসলমানের তুলনায় আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) শত্রু বেশী প্রিয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই কথাঃ

''হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও বন্ধু (সমর্থক ও সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহন করিও না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরনের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে-ই যালেম (অন্যায়কারী) হবে।'' (সূরা আত-তওবাহ ৯, আয়াত ২৩)

''তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে [মুশরিকদেরকে] বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা জালেমদেরকে হেদায়াত করেন না।'' (সূরা মায়িদাহ ৫, আয়াত ৫১)

9 নয়ঃ যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সে শারিয়াহ এর মধ্যে (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইন) বিভিন্ন জিনিস যোগ করা অথবা এর কতিপয়

বিষয় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি সাধন করতে পারবে তাহলে সে কাফির হয়ে যায়।

এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) পরিপূর্ণভাবে সকল মানুষের জন্য তার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ইসলামের বাণী পাঠিয়েছেন এবং যদি কেউ এটা অস্বীকার করে তাহলে সে কুরআনের এই আয়াতের বিরুদ্ধে যায়ঃ

''আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।'' (সূরা আল-মায়িদাহ ৫, আয়াত ৩) দশঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী শিক্ষা না করা অথবা সে অনুযায়ী কাজ না করার মাধ্যমে কেউ আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তায়ালার) বাণীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যায়। আল-কুরআনে এর প্রমাণ হচ্ছেঃ

''তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যাকে তার আল্লাহর আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দান করা হয় এবং তা সত্ত্বেও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে? এসব পাপীদের ওপর তো আমরা প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব।'' (সূরা আস-সাজদাহ ৩২, আয়াত ২২)

এগুলোই দশটি বিষয় যা কোন ব্যক্তির ইসলামকে অকার্যকর করতে পারে এবং যদি সে তার ভুলের জন্য আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এর কাছে অনুতপ্ত না হয় এবং সে মৃত্যু বরণ করার আগে আবার ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে একজন মুশরিক (পৌত্তলিক) বা একজন কাফিরের (অবিশ্বাসী) মৃত্যুবরণ করে, আর তার গন্তব্যস্থল হয় অনন্ত কালের জন্য দোজখের আগুন এবং কোনদিনও জাহান্নামের আগুন থেকে বের করা হবে না।

মূলঃ আল্লাহর দিকে আহবান

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭৫

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হচ্ছে দলগতভাবে একটি মুরতাদ বাহিনী

Umar Faruq

Senior Member

০৮-৩০-২০১৫

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হচ্ছে দলগতভাবে একটি মুরতাদ বাহিনী, যদিও এর ভিতর কোন কোন ফাসিক মুসলমান, এমনকি মুমিনও থাকতে পারে। তবে এই কারণে "এই মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্বক জিহাদের হুকুম" এ কোন পরিবর্তন হবে না।

মুরতাদ বাহিনী

১। এই মুরতাদ বাহিনীকে দলগত তাকফীরঃ

তাকফীর তাইফাতুল কুফর বা কোন দলকে তাকফীর করা - এই বিষয়টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেননি বরং এটা ঈমান ও কুফরের বিষয়।

এরকম পরিস্থিতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ও এসেছিল যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া একদল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধীতা করেছিল। তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে হত্যা করা হয়, আল কোরআনে এ কাজের প্রশংসা করা হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা অনুমোদন করেন।

এই ব্যাপারে দলিল দেবার পূর্বে আমরা এই ব্যাপারে কিছু মূলনীতি আলোচনা করতে চাই। তা হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। আমরা সকল ভাই-বোনকে এটা জানাতে চাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের ব্যাপারে দুইটি নিয়ম করেছেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার ঈমানের অবস্থা; আরেকটি হচ্ছে তার দল কিংবা যে দলের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন রয়েছে, যে দলের জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সেই দলের ঈমানের অবস্থা সংক্রান্ত।

এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে:

ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান:

এরা হচ্ছেন ঐ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরুপ: আনসার ও মুহাজির উভয় দলের সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণ। কিংবা ঐসকল মুসলমান যারা এমন কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, যেখানে এমনকি যদিও খলিফা জুলুমকারী হয়, শরীয়ত তখনো পূর্ণাঙ্গ থাকে এবং মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ হচ্ছে: ঐ সকল মুসলমানগণ যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছেন, সমর্থন করছেন তারাও এই দলে পড়বেন যদিও তারা ঐ দলে শরীক হতে পারছেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَوَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُعَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন।

আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে করুন।" - সূরা আল বাকারাহ: ২৮৬

খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের:

এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আসল কাফের (অর্থাৎ, সে ইসলাম গ্রহন করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেনি, বরং পূর্বের থেকেই সে কাফের, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) ও মুর্তাদ (যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শির্*ক করার মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেছে) হবার কারণে ইসলামের বাহ্যিক আমলগুলি সম্পাদন করে না। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি কোন কাফের কিংবা মুর্তাদ দলের অনুগত থাকে এবং ঐ দলের পক্ষে কাজ করে।

উদাহরণ স্বরুপ: বর্তমান মুসলমান দেশসমূহে সেনাবাহিনীগুলোতে কর্মরত ইহুদী-খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, অগ্নি উপাসক ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি ইত্যাদি। কারণ মুসলমান দেশের সেনাবাহিনীগুলিও বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের রক্ষক না হয়ে বিরোধীতা করছে – তাই এসব সেনাবাহিনী দলগতভাবে কাফের দল।

গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান:

এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাইরে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে। এবং সে এমন একটি দলের অংশ যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী করতে পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল।
বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুর্তাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা

মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায়। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং এ যোগদান করে।

তাদের স্বরুপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দুরার আস সুন্নিয়া, ৯ম খন্ড,মুর্তাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে।

ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের:

এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এটাকে ভালোভাবে না বুঝলে তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যাবে। খারেজী, তাকফীরী ও মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও এরকম দল ছিল যখন রিদ্দাহ্* এর ঘটনা ঘটেছিল। যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও এইরকম দল ছিল।

সত্যি কথা হলো: বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও তাই। ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরজ-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে তাহাজ্জুদ পালনকারী, হজ্জ আদায়কারী। কিন্তু যারা *শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বাধাপ্রদান করছে – সে ঐসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত কাফের অথবা মুর্তাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তায়েফের ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, নামাজ পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর পাথর, আগুন

ও সাপ-বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে – যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামাজ পড়তো কিংবা ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো। এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় ঐ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে যারা তখনও হিজরত করেনি। এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভয় দেখাতে চেয়েছিল। এসব মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জানিয়েছিলেন যে, "বনী হাসিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে উনাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয় কারণ তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: "ওহ তাহলে আমরা আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দিবো, তাদেরকে হত্যা করবো না।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছিলেন, "তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখে চড় মারা হোক?" উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ঐ সাহাবীকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলেন।

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসবই পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর ছোঁড়া কিছু কিছু তীর ঐ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও আনসার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: "আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি।" তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهْتَدُونَ سَبِيلاً

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এই ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" - সূরাহ্* আন নিসা: ৯৭-৯৮ এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু ঐ সকল দুর্বল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের শাস্তি মাফ করে দেন যারা দুর্বল ও নিরুপায়। কিন্তু এই ঘটনায় কোন কুফরের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "আপনার এই যুক্তিটি বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে: "আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো। আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন।" (বিস্তারিত: সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল গাযওয়া)

তারপর তিনি আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًامِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم

“হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মংগল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” - সূরাহ্* আল আনফাল: ৭০

অতঃপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী)

কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” - সূরা আন নিসা: ৭৬

এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি নিয়ম পাওয়া যায়:

ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে মুমিন যদিও ঐদলে মুনাফিক থাকতে পারে। তারপরও সেটা মুমিনদের দল।

খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোন প্রতিদ্বন্দীর জন্য অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের জন্য লড়াই করে, তারা একটি কুফরের দল যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয় ভাবে তাদেরকে কুফরের দল গণ্য করা হবে।

গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, কোন

দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক দিক দেখেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং এই যুদ্ধ অবশ্যই চলবে।

তাহলে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দলকে কুফরের দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা ঈমানদারদের দল। যদি তারা তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে তারা কুফরের দল। আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল তাগুত। আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল।

এছাড়াও নীচের হাদীসেও একটি দলকে ঈমান ও অন্য দলকে কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "একটি বাহিনী কাবা শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদাহতে আসবে তখন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে ফেলবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিভাবে পৃথিবী তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে অথচ সেখানে কেউ কেউ থাকবে বাজারে আরও অনেকে থাকবে যারা ঐ বাহিনীর নয়।" তিনি বললেন: "সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে ফেলবে অতঃপর যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে।" (সহীহ বুখারী)

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: "সেখানে তো অনেকে থাকবে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে।" ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্ণনায় এসেছে: "যদি তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?" এ থেকে বুঝা যায় যে ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার থাকবে।

যদিও ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের নাও বলা হতে পারে। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সুস্পষ্ট অবস্থান, আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান।

তাই সেনাবাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া,যে কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মূলনীতি এটা নয় যে,তারা কোন দলের সকল ব্যক্তিকে একসাথে ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফীরুল মুয়াইয়িন) করেন।

এমনও হতে পারে যে, সেখানে কোন নিরুপায় বাধ্যগত মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে।
এমনকি সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে,যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। যেমন: মিশর সেনাবাহিনীতে খালিদ আল ইস্তাম্বুলি (রাহিমাহুল্লাহ) [[উনি ছিলেন মিশরের একজন আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্বুলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আহমদ আনওয়ার আস সাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ তে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অত:পর ভাই খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে মুবারকের ক্ষমতায়নের জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করে।]] ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে এসেছে:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

وَقَدْجَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُوَإِنيَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।" - সূরা আল মুমিন ৪০:২৮

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় এই দলটির কাফের হবার শরীয়তি সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের পরিবারের দুই/এক জন মূসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি।

তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল। এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করা উচিত যতক্ষণ না তারা ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে। ছোট কিংবা বড় কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত না নেয়।

যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়,তাদেরকে আমরা তাগুত বলি।

অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই হচ্ছেন দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করেন।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী / খারেজী দলগুলো ভুলে যায় এবং মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার

আহবান জানায়। এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই হয়,তাহলে এসব দেশকে মুর্তাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল 'মুর্তাদ'দের (অর্থাৎ, সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে!! এভাবেই অজ্ঞ এবং বোকা মুসলমানদের তারা আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে ধোঁকা দেয় এবং ক্ষমতার প্রলোভন দেখায়।

সুত্রঃ শাইখ আবু হামযা আল মিসরী (আল্লাহ তাঁকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করুন)

২। এই মুরতাদ বাইনীর ব্যাপারে হুকুমঃ

বর্তমান বিশ্বের যেকোন দেশের সেনাবাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের শত্রুদের স্বার্থ রক্ষা করা। এটা হচ্ছে মুসলিম ইতিহাসের মধ্যে অত্যন্ত জঘন্যতম একটি অধ্যায়!

এই সেনাবাহিনীর দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্যকে বাসত্মবায়ন করা হয়ঃ

প্রথমতঃ দেশের রাজা অথবা প্রেসিডেন্ট এবং তার সহচরদেরকে রক্ষা করা অর্থাৎ তাগুতের রক্ষাকারী

দ্বিতীয়তঃ এই উম্মতের শত্রু অর্থাৎ ইহুদী এবং আগ্রাসী (আমেরিকার) শক্তির স্বার্থ রক্ষা করা।

সুতরাং যদি কোন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া এই ফরজ আমল দুটি পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও তখন ফরজ হয়ে যায়।

- এই সেনাবাহিনী মুসলিম দেশগুলোতে মুরতাদ শাসকদেরকে রক্ষা করছে।

- এরা ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং

- যারা এই শরীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদেরকে হত্যা করছে।

- তারা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পাকিস্থান, সোমালিয়া এবং পশ্চিমা বিশ্বের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

যদি সেনাবাহিনীর অবস্থা এই হয় তবে কেন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ঐ সকল মুজাহিদীনদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে যে, 'তারা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে'? এটা কোন্ ধরনের বিভ্রান্তকর যুক্তি?

দোষারোপ তো করা উচিত ঐ সকল সেনাবাহিনীদের প্রতি যারা সামান্য বেতনের বিনিময়েঃ

- স্বেচ্ছায় সোয়াতের মুসলিমদের হত্যা করছে,

- বোমা দিয়ে ধ্বংস করছে মসজিদগুলোকে যেমনটি তারা লাল মসজিদের সাথে করেছে

- সোমালিয়াতে মহিলা ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করছে।

ঐ সেনাবাহিনীগুলো নিষ্ঠুর পশুর মত! যারা সামান্য ডলারের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং মানুষরূপী কিছু শয়তানের সামনে তাদের মাথা নত করে আছে। এরাই এই উম্মদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব।

যারা এই সেনাবাহিনীর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের উপর আল্লাহর দয়া ও রহমত বর্ষণ করুন এবং যারা এদের দ্বারা নিহত হচ্ছেন সেই সকল শহীদদের উপর আল্লাহর দয়া ও রহমত দান করুন।

সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৬১